চারু ও কারুকলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা
হাশেম খান
এডলিন মালাকার
এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম
সন্‌জীব দাস

সম্পাদনা
মুস্তাফা মনোয়ার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
সুজাউল আবেদীন
সুদর্শন বাছার

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
হাশেম খান
এডলিন মালাকার
সন্‌জীব দাস
এ.এস.এম. আতিকুল ইসলাম
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

কম্পিউটার কম্পোজ
বর্ণনস কালার স্ক্যান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে। প্রকৃতিকে স্থির ও সুশৃঙ্খলভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে মানসিক, দৈহিক ও নান্দনিক দৃষ্টিতে তুলে ধরতে **চারু ও কারুকলা** বিষয়টি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীদের শিল্পবোধ ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধ তৈরির ক্ষেত্রে চারু ও কারুকলা বিষয়টি অতি জরুরি। এই বিষয়টি পাঠদানের জন্য তাই ব্যবহারিক ও হাতে কলমে কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করি ৬ষ্ঠ শ্রেণির **চারু ও কারুকলা** পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
প্রথম	**চারু ও কারুকলার পরিচয়**	১–৬
	● চারুকলার পরিচয়	
	● কারুকলার পরিচয়	
	● আদিম মানুষের শিল্পকলা	
দ্বিতীয়	**বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস**	৭–১৪
	● বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষা এবং পথিকৃৎ শিল্পীরা	
	● বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প	
	● শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবি	
তৃতীয়	**বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প**	১৫–২৩
	● লোকশিল্পের ধারণা	
	● বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয়	
	● কারুশিল্পের ধারণা	
	● বাংলাদেশের কারুশিল্পের পরিচয়	
চতুর্থ	**ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম, উপকরণ ও মাধ্যম**	২৪–৩৯
	● ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম	
	● বিষয় সাজানো	
	● আলোছায়া	
	● ছবি আঁকার প্রাথমিক উপরকণ	
	● কালি কলম ও কালি তুলি	
	● ছবি আঁকার রং	
	● ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম	
	● পেনসিল রং ও প্যাস্টেল রং	
পঞ্চম	**ছবি আঁকার অনুশীলন**	৪০–৪৮
	● দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের অনুশীলন	
	● প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুশীলন	
	● বিষয়ভিত্তিক ছবির অনুশীলন	
	● নকশা	
ষষ্ঠ	**কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম**	৪৯–৬০
	● কাগজের ঝালর	
	● কাগজের নকশা কাটা ফুল	
	● শাপলা ফুল	
	● ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম	
	● নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য	
	● পাতা দিয়ে জিনিস তৈরি	
	● পালক ও ছোট কৌটা দিয়ে শিল্পকর্ম	
	রঙ ও রঙের ব্যবহার	৬১–৬৮

প্রথম অধ্যায়

চারু ও কারুকলার পরিচয়

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'বিদ্রোহ'

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা

- চারু ও কারুকলার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছবি আঁকার সূচনালগ্নের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- কারুশিল্পের সূচনায় আদিম মানুষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

চারুকলার পরিচয়

শিশুরা ছবি আঁকে, বড়রাও ছবি আঁকে– এই ছবি আঁকাই হলো চারুকলার প্রধান বিষয় এবং পরিচয়। এছাড়াও উপরের শ্রেণিতে তোমরা চারুকলার পরিচয় সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে। ছবি আঁকা হয় কাগজে, কাপড়ে বা ক্যানভাসে, মাটির ফলকে, সিমেন্টের ফলকে, দেয়ালে, কাঠের পাটাতনে– এমনি বিভিন্ন বস্তুর ওপর। এক সময়ে তালপাতায় বা গাছের বড় পাতায় লেখা হতো এবং সেই সঙ্গে ছবিও আঁকা হত। জাদুঘরে গেলে তোমরা পুরনো দিনে যত রকম বস্তু বা সামগ্রীর ওপর ছবি আঁকা হত তা দেখতে পাবে।

এখন ছবি আঁকার জন্য নানা ধরনের কাগজ তৈরি হচ্ছে, ক্যানভাস তৈরি হচ্ছে, ধাতব প্লেট বা জমিন তৈরি করা হচ্ছে। মাটির ফলক এখন অনেক উন্নত হয়েছে। অনেক দিন থেকে কাচের ওপর রং দিয়ে যেমন আঁকা হচ্ছে, অন্যদিকে ধারালো ছুরি বা সুচালো পাথর দিয়ে আঁচড় কেটে ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। কাগজে, ক্যানভাসে, মাটিতে, পাথরে, ধাতুর পাতে ও কাচের ওপর ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য রয়েছে নানারকম উপায়, পদ্ধতি। রঙের কথা তোমরা জান। ছবি আঁকার জন্য এখন অনেক রকম রং। পানিতে মিশিয়ে যে রং তৈরি করা হয় তার নাম জলরং। মোম মেশানো এক রকম রঙের কাঠি তৈরি হয়েছে, তার নাম প্যাস্টেল রং। রঙের সাথে তেল ও তারপিন মিশিয়ে বড় বড় শিল্পীরা ক্যানভাসে বা কাঠের পাটাতনে যে ছবি আঁকেন, তার নাম তৈলরং বা তেলরং।

বর্তমানে ছবি আঁকার জন্য অ্যাক্রেলিক রং নামে এক ধরনের রঙে খুব তাড়াতাড়ি ছবি আঁকা যায়। এই রং পানি ও তেল মিশিয়ে দুরকমভাবেই করা যায়। বাংলাদেশের শিল্পীদের কাছে অ্যাক্রেলিক রং এখন বেশ প্রিয়। এই অ্যাক্রেলিক রঙে ছোটরাও ছবি আঁকতে পারে। তবে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি আঁকতে হয় বলে ছোটদের জন্য একটু কঠিন। ছোটদের জন্য জলরং, পোস্টার রং, মোম প্যাস্টেল– এসব রংই ভালো।

পাঠ : ২

ছবি আঁকার জন্য ও ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য রয়েছে নানারকম পেনসিল, কলম, কালি, ছুরি, কাঁচি, হাতুড়ি, বাটাল ইত্যাদি। আরও রয়েছে নানা ধরনের তুলি। চারুকলা চর্চা করতে করতে বা ছবি আঁকতে আঁকতে এসব বিষয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটবে।

আঁকা ছবি কী- কেমন করে হয়, ইতিমধ্যে তোমরা জানতে পেরেছ। তোমাদের মতো শিশুরা কীভাবে ছবি আঁকে তার পরিচয় নিজে আঁকতে গেলেই বুঝতে আরও সহজ হবে। ছোটদের ছবি আঁকার এখন অনেক প্রতিযোগিতা হচ্ছে- সেসব ছবির প্রদর্শনীও হচ্ছে। বাংলাদেশের শিশুদের ছবি বিশ্বের অনেক দেশেই নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে প্রতিযোগিতার জন্য। তোমাদের মতো অনেক শিশুই সেসব দেশ থেকে পুরস্কার পেয়ে বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে।

আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পীদের প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন গ্যালারি, শিল্পকলা একাডেমীতে, জাদুঘরে ও বিভিন্ন স্থানে। সেসব প্রদর্শনী তোমরা নিশ্চয় কিছু কিছু দেখেছ। না দেখে থাকলে গিয়ে দেখে আসবে। এ ছাড়াও আমাদের জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সব শিল্পকলা বা চারুকলার সব সময়ের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে গেলেই চারুকলার সঙ্গে তোমাদের চমৎকার পরিচয় ঘটবে।

কাজ : পাঁচ-ছয়জনের দল গঠন করে প্রতি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চারুকলার পরিচয় সম্পর্কে ৫-৬টি লাইন লেখ।

পাঠ : ৩

কারুকলার পরিচয়

কারুশিল্প

বিভিন্ন রকম নকশায় যেসব আসবাবপত্র তৈরি হয় সবই কারুশিল্প। বাঁশ, বেত দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের বেতের চমৎকার সব কারুশিল্প দেশে ও বিদেশে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে। আমাদের দেশের অনেক শৌখিন পরিবারে, নামকরা হোটেল-রেস্তোরাঁয়, সরকারি-বেসরকারি অফিস ও অতিথিশালায় বেতের তৈরি কারুশিল্পমণ্ডিত আসবাবপত্র সমাদর পাচ্ছে। জাদুঘরে গেলে কারুকলা বিষয়ের সঙ্গেও তোমাদের পরিচয় ঘটবে। ঘর-বাড়ির বড় বড় দরজার ওপর রয়েছে কাঠ খোদাই করে নানারকম ছবি, নকশা, ফুল, পাতা, পাখি, জীবজন্তু। বড় বড় খাট, পালঙ্ক ও বিছানায় দেখতে পাবে অনেক ধরনের কারুকাজ ও নকশা।

আমাদের সামাজিক জীবনযাপনে ও পারিবারিক জীবনযাপনে ব্যবহৃত বহু বস্তুসামগ্রী রয়েছে, যা কারুশিল্প। গ্রামীণ জীবনে দা, কুড়াল, লাঙ্গল, কাস্তে, বাখারি, মাটির হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি সবই কারুশিল্প। কারুশিল্পের পাশাপাশি রয়েছে সাধারণ মানুষদেরই তৈরি অন্যান্য শিল্প- যা লোকশিল্প হিসেবে পরিচিত। সোনা-রুপার তৈরি নানারকম অলংকার, নকশিকাঁথা, মাটির পুতুল, চিত্রিত কাঠের পুতুল, (হাতি, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি) আমাদের লোকশিল্পের নিদর্শন।

পাঠ : ৪

নববর্ষ, ঈদ, পূজা, বৌদ্ধপূর্ণিমা বা বড়দিন উপলক্ষে শহরে ও গ্রামে মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে কারুশিল্প ও লোকশিল্পের সমারোহ দেখা যায়। গান-বাজনার জন্য যেসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়- যেমনঃ একতারা, দোতরা, তবলা, বায়া, সারেঙ্গী, সেতার, ডুগডুগি, নানারকম বাঁশি, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র কারুশিল্প। তবে এসব বাদ্যযন্ত্রের গায়ে যেসব নকশা ও ছবি আঁকা হয়, সেগুলো আবার লোকশিল্প। মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কাঁসা ও পেতলের হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করা হলো কারুশিল্প।

মূর্তা নামে পাটি তৈরির জন্য একপ্রকার বিশেষ গাছ থেকে সরু সরু নরম ফিতা বের করে বেশ পরিশ্রম করে শীতলপাটি তৈরি করা হয়। এসব পাটিতে নানারকম জীবজন্তু, ঘর-বাড়ি, ফুল ও গাছের নকশা বুননের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। সুন্দর সুন্দর বাণী ও কথা ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পাটি কারুশিল্প ও লোকশিল্পের মিশ্রিত রূপ। এ ধরনের আরও অনেক শিল্পবস্তু রয়েছে। যেমন- শখের হাঁড়ি, পোড়ামাটির টেপা পুতুল ও অন্যান্য পুতুল, লক্ষ্মীসরা-এগুলো লোকশিল্প।

পাট দিয়ে গ্রামের মেয়েরা অনেক কাল আগেই শিকা তৈরি করত। শিকাতে পাট দিয়ে নানারকম বেণিসহ অনেক কারুকাজ থাকে। আজকাল পাটের আঁশ দিয়ে অনেক রকম কারুকাজ করা শিল্পকর্ম তৈরি হচ্ছে এবং মানুষ আনন্দের সঙ্গে সেগুলো ব্যবহার করছে। যেমন- ছোট-বড় ও শৌখিন জিনিসপত্র বিভিন্ন ব্যাগ, টেবিলম্যাট, মেঝেতে বিছানোর জন্য নানারকম ম্যাট, জুতা, সেন্ডেল, ফাইল, বাক্স ইত্যাদি।

কাজ : আমাদের সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত হয় এ রকম ১০টি কারুশিল্পের নাম লেখ।

নতুন শিখলাম : মূর্তা।

পাঠ : ৫ ও ৬

আদিম মানুষের শিল্পকলা

মানুষের আঁকা প্রথম ছবি

আদিম মানুষরাও ছবি আঁকত। আর তাদের আঁকা ছবি দেখেই আজ আমরা জানতে পেরেছি তাদের জীবন ধারনের কথা। ঘর-বাড়ি তাদের ছিল না। বানাতেও জানত না। থাকত তারা গুহায়, চাষবাস, ফসল ফলানে-এসব কিছুই জানত না। পশু শিকার করে, মাংস খেয়ে জীবন বাঁচাত। যে গুহায় তারা বাস করত দল বেঁধে, সে গুহার এবড়োথেবড়ো দেয়ালেই তারা ছবি এঁকেছে। অনেকগুলো গুহা ফ্রান্সে ও স্পেনে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঘর সাজাবার জন্য তারা ছবি আঁকত না। কারণ ঘরই বানাতে শেখেনি, ছবি টাঙাবে কী! তবে কেন আঁকত জান? ছবি আঁকা আদিম মানুষের কাছে ছিল একটা যাদু বিশ্বাসের মতো। জীবজন্তু শিকার করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। তাই যেসব পশু তারা শিকার করত, তার ছবিই এঁকেছে। আবার পশুর গায়ে তীর, বর্শা, এসবও এঁকে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, শিকার করার হাতিয়ার দিয়ে পশুটিকে শিকার করা হলো। শিকারে বের হবার আগে এসব ছবি এঁকে শিকারে বের হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে শিকারে আজ সফল হবই। সে যুগের বেশিরভাগ জীবজন্তু ছিল বাইসন, ম্যামথ ইত্যাদি।
তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করে, কী দিয়ে আদিম মানুষরা ছবি আঁকত? তুলি দিয়ে? রং পেত কোথায়? হ্যাঁ, আমাদের মতো তারা এত সুন্দর তুলি বানাতে জানত না। পশুর শক্ত হাড় সুচালো করে তা দিয়ে আঁচড় কেটে রেখা টানত। জীবজন্তুর পশম একসঙ্গে বেঁধে তুলি বানাত, আর রং তৈরি করত নানা রঙের মাটির সঙ্গে চর্বি মিশিয়ে। আর অবাক কাণ্ড-হাজার হাজার বছর পরও এসব ছবির রং, রেখা এখনো খুব সুন্দর ও অক্ষত রয়েছে।

আদিম মানুষ পশু শিকারের জন্য পাথরের তৈরি বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করত। একপর্যায়ে এসব হাতিয়ারের গায়ে আঁচড় কেটে তারা নানারকম ছবি ফুটিয়ে তুলত। এমনকি তারা মাছের মেরুদণ্ডের কাঁটা, হাড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে গলার হার (মালা) তৈরি করত। সেখান থেকেই কারুশিল্পের শুরু। এভাবে আদিম মানবগোষ্ঠী চারু ও কারুশিল্পের সূচনা করেছিল।

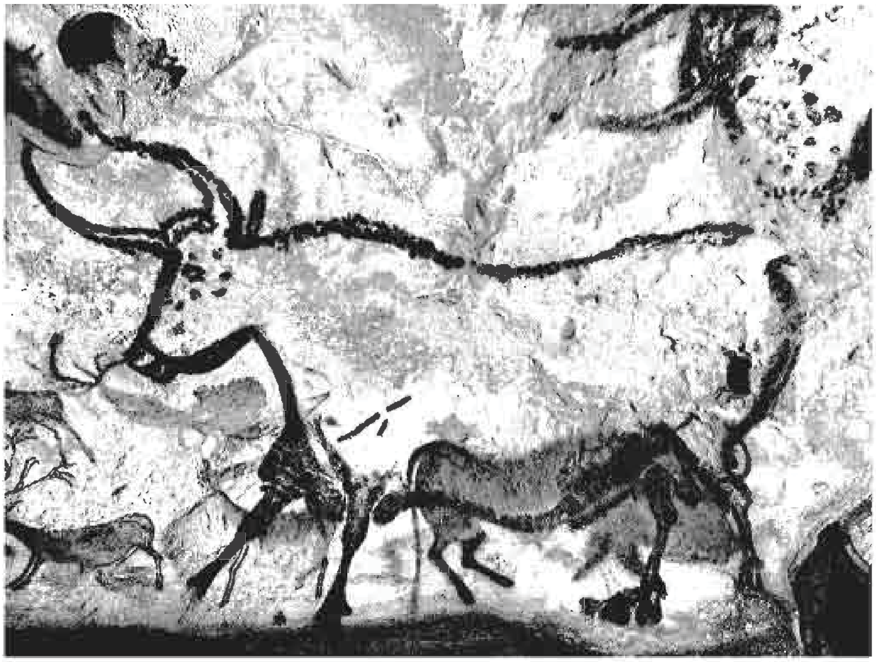

আদিম মানুষের আঁকা ছবি

কাজ : আদিম মানবগোষ্ঠীই চারু ও কারুশিল্পের সূচনা করেছিল- কথাটির ব্যাখ্যা লেখ।

নতুন শিখলামঃ বাইসন, ম্যামথ।

পাঠ: ৭ ও ৮

আদিম মানুষের পর কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে। পৃথিবীর কত উত্থান-পতন হয়েছে। কত জাতি, কত সভ্যতা এসেছে, আবার বিলীনও হয়ে গেছে। সব সভ্যতার কথা আমরা না জানলেও অনেক সভ্যতার কথা আমরা জানি। আর এই জানার উৎস হচ্ছে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারুশিল্প। তাদের বই-পুস্তক হয়ত বিলিন হয়ে গিয়েছে, ভাষা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু ধ্বংসাবশেষে যেসব চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকেই পন্ডিতরা বের করতে পারেন সে যুগের মানুষের চাল-চলন, সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস।

উদাহরণস্বরূপ : এ্যাসিরিও সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা প্রভৃতি। কারণ, চিত্রকলা বা শিল্পকলা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ভাষা বা পৃথিবীর ভাষা অর্থাৎ এক দেশের বা এক যুগের চিত্রকলা বা শিল্পকলা অন্য দেশের লোকের কয়েক যুগ পরেও বুঝতে কষ্ট হয় না। মনে কর, আফ্রিকার জিম্বাবুয়ের একটি নিগ্রো ছেলে তোমাকে একটি ছবি এঁকে পাঠাল। ছবিটি পেয়ে তোমার খুব ভালো লাগল এবং তুমি খুবই আনন্দিত। কারণ ছবিটি বুঝতে তোমার কষ্ট হয়নি। কিন্তু সেই ছেলেটি তার ভাষায় তোমার অনেক প্রশংসা করে বা গুণগান গেয়ে তোমাকে চিঠি লিখল। তুমি তার এক বর্ণ বুঝলে না কারণ তুমি জিম্বাবুয়ের ভাষা জানো না। কিন্তু একই ছেলের আঁকা ছবি বুঝতে তোমার কোনো কষ্টই হয়নি।

কাজ : পাঁচ-ছয়জনের দল গঠন করে প্রতি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আদিম মানুষের ছবি আঁকার কারণ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

১. শুদ্ধ উত্তরের নিচে দাগ দাও।

(ক) আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে– কাগজে/ গুহার গায়ে/ দালানের দেয়ালে।

(খ) আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে– রঙিন মাটির সাথে চর্বি মিশিয়ে/ টিউবের রঙে/ ডিমের কুসুম মিশিয়ে।

(গ) আদিম মানুষের বিষয় ছিল– নদী-নালা/ ঘর-বাড়ি/ শিকার করা জন্তু।

(ঘ) আদিম মানুষের আঁকা ছবি যে পাহাড়ের গুহায় প্রথম পাওয়া যায় তার নাম– আল্পস পর্বত/ আলতামিরা/ লাসকো।

(ঙ) আদিম মানুষ পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ড্রইং করত– পেনসিলে/ ছুরিতে/ পশুর হাড় সুচালো করে।

(চ) আদিম মানুষ ছবি আঁকত– প্রদর্শনী করার জন্য/ ছবি বিক্রি করার জন্য/ যাদু বিশ্বাসের জন্য/ পশু শিকারে সফল হবে বলে।

(ছ) বাংলাদেশের বিখ্যাত লোকশিল্প– জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি/ নকশিকাঁথা/ বইয়ের ছবি।

(জ) নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, মাটির পোড়া পুতুল ইত্যাদি বিখ্যাত– লোকশিল্প/ কারুশিল্প/ আধুনিক শিল্প।

(ঝ) কাঠের রিলিফ কাজ, তামা-কাঁসার হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি বাংলাদেশের– চারুশিল্প/ কারুশিল্প/ আধুনিক শিল্প।

(ঞ) মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল বানায়– কুমারেরা/ তাঁতিরা/ কামারেরা।

(ট) দা, কুড়াল, কাঁচি বানায়– কামারেরা/ তাঁতিরা/ কুমারেরা।

(ঠ) কুরআন শরিফের রেহেলে যে নকশা, তাতে থাকে– মাছ-পাখির নকশা/ লতা-পাতার নকশা/ ফুল-ফলের নকশা।

(ড) জায়নামাজে থাকে– মসজিদ ও মিনারের ছবি/ মানুষ ও হাট-বাজারের দৃশ্য/ শহর ও গ্রামের দৃশ্য।

২. চারুকলা বলতে কী বুঝ? সংক্ষেপে লেখ।

৩. কারুশিল্প বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস

শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা

- বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষার কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শিল্পকলায় পথিকৃৎ শিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- চারু ও কারুকলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ: ১

বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষা এবং পথিকৃৎ শিল্পীরা

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে বাংলাদেশের মানুষ সবাই ভালোভাবে জানে এবং চেনে। বাংলাদেশে ছবি আঁকা ও শিল্পকলা চর্চায় তাঁর অবদান অনেক। ছবি আঁকা ও শিল্পকর্ম করা হলো একটা সুন্দর ও ভালো কাজ। সমাজকে সুন্দর করার জন্য, মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য, আনন্দে থাকার জন্য ছবি আঁকা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। এই কথাটা তিনি এদেশের মানুষকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন। আজ যে এ দেশে ছবি আঁকা হচ্ছে, ভাস্কর্য হচ্ছে, পোস্টার হচ্ছে, পোশাক-পরিচ্ছদে নকশা হচ্ছে, টেলিভিশনে, সিনেমায়, বই-পুস্তকে, খবরের কাগজে, বিভিন্ন জিনিসপত্রের মোড়কে, বাক্সে ছবি আঁকা ও নকশার প্রয়োজন হচ্ছে। এসব দরকারের কথা, শিল্পকর্মের কথা, জয়নুল আবেদিন ও তাঁর অন্য শিল্পী বন্ধুরা অনেক দিন ধরে ছবি এঁকে, ছবি আঁকার স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে বুঝাতে পেরেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা হলেন কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমিন, খাজা শফিক আহমদ ও হবিবুর রহমান। আর এরাই হলেন বাংলাদেশের প্রথম দিকের চিত্রশিল্পী। যাঁদের আমরা বলি পথিকৃৎ শিল্পী, এঁরাই সর্বপ্রথম ছবি আঁকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীকালে গত ষাট বছরে তিনবার নাম, স্থান ও পরিধি পরিবর্তন হয়। বর্তমানে সেই প্রতিষ্ঠানটি শাহবাগে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ নামে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো শিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের শিশু-কিশোররা আজ অনেকেই ছবি আঁকছে। শিক্ষিত পরিবারের বাবা-মা মনে করছেন, ছবি আঁকা শিশুদের জন্য একটি ভালো কাজ, সুন্দর কাজ, তাই তারা শিশুদের নিয়ে যাচ্ছেন ছবি আঁকার স্কুলে, চিত্রপ্রদর্শনীতে ও নানারকম প্রতিযোগিতায়। রং, তুলি, কাগজ জোগাড় করে শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের শিশু-কিশোররা অন্যান্য দেশে বিশেষ করে, জাপান, চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ আরও অনেক দেশে হাজার হাজার শিশু-কিশোরদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনেক পুরস্কার পাচ্ছে। এভাবে তারা বাংলাদেশের জন্য সুনাম অর্জন করছে।

কাজ : ১. ৫-৬ দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি দল ছবি আঁকার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর। দেখা যাক কোন দল সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করতে পার।

কাজ : ২. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন যাদেরকে নিয়ে প্রথম আর্ট স্কুল তৈরি করেছিলেন তাদের নাম লেখ।

পাঠ: ২

বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প

বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকা প্রথম সংগঠিতভাবে শুরু করে শিশু-কিশোর সংগঠন, 'খেলাঘর' ও 'কচি-কাঁচার' মেলা। ১৯৫৬ সালে খেলাঘর বাংলা একাডেমীতে ছোটদের জন্য বেশ বড়সড় এক চিত্রপ্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। অনেক শিশু-কিশোর নিজেদের আঁকা ছবি দিয়ে সেই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। এ দেশে সেই প্রদর্শনীটি ছিল শিশুদের আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী। এরপর কচি-কাঁচার মেলা ১৯৫৮ সালে একটি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু করে ছোটদের ছবি আঁকার স্কুল। নাম দেয় 'শিল্পবিতান'।

কচি-কাঁচার মেলা সে সময় শিশুদের সংস্কৃতিচর্চা, শিল্পকলা চর্চা ইত্যাদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করে। স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়া, গান গাওয়া, নাটক করা, ছবি আঁকা, বিতর্ক করা ও খেলাধুলায় আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে।

শিল্পী হাশেম খান তখন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার সক্রিয় সদস্য (সাথীভাই)। ছোটদের ছবি আঁকার বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন ধরে ভাবছিলেন কী করে সংগঠনের মাধ্যমে উপযুক্ত ও যথাযথভাবে ছবি আঁকায় শিশুদের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিভাবকরা শিশুদের সঙ্গে নিয়ে ছুটির দিন বিকেলে কচি-কাঁচার মেলায় চলে আসতেন।

কচি-কাঁচার মেলার একটি ঘরে একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে শিশুদের আঁকতে বলতেন। শিশুদের জন্য অনেক কাগজ, রং, তুলি আগেই তৈরি থাকত। শিশুরা এত রং, কাগজ দেখে আনন্দে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ধীরে ধীরে একসঙ্গে বসে গল্প, হাসি ও খেলার মতো করে ইচ্ছেমতো রংতুলি নিয়ে আঁকিবুকি করতে করতে এক একটি ছবি এঁকে ফেলত। নিজেরাই নিজেদের আঁকা দেখে খুশিতে বাগ বাগ। অভিভাবকরাও তাদের শিশুদের কল্পনাশক্তি দেখে যেমন অবাক হতেন, তেমনি খুশিও হতেন। এভাবেই গড়ে ওঠে শিশুদের ছবি আঁকার খেলাঘর শিল্পবিতান। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, শিল্পী শফিউদ্দিন আহমদ, শফিকুল আমিন প্রমুখ চিত্রশিল্পী কচি-কাঁচার মেলার এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও শফিকুল আমিন পরবর্তীকালে কচি-কাঁচার মেলা ও শিল্পবিতানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশুদের ছবি আঁকা ও অন্যান্য সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ যোগান।

কাজ : শিশুদের ছবি আঁকার স্কুল শিল্পবিতান কীভাবে গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে ৮ লাইন লেখ।

পাঠ : ৩

কিছু দিনের মধ্যে শিল্পবিতানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকার বেশ সাড়া পড়ে যায়। কচি-কাঁচার মেলা শিল্পবিতানের শিশুদের ও সারা দেশের শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি নিয়ে প্রতিবছর নিয়মিত চিত্রপ্রদর্শনী ও আনন্দ মেলার আয়োজন করে। ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১ সালে ঢাকায় প্রেসক্লাবের মাঠে এই আনন্দ মেলা শিশুদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায়। এই আনন্দ মেলা ও চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশুদের ছবি আঁকা বিষয়টি সারা দেশে গ্রামে-গঞ্জে, এমন কী পাহাড়ি দুর্গম এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। হাজার কয়েক ছবি আসত সারা দেশ থেকে। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা ও গ্রামের ছেলেমেয়েরা বেশ সুন্দর ছবি এঁকে পাঠাত।

১৯৫৮ সালের ৫ অক্টোবর দিনটি ছিল কচি-কাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠার দিন। ঢাকা শহরের উৎসাহী শিশু-কিশোরদের আঁকা বেশ কিছু ছবি ও কারুকাজ সংগ্রহ করা হলো। দৈনিক 'ইত্তেফাক' অফিসের নিচতলায় দুটি কামরায় ছিল কচি-কাঁচার মেলার অফিস ও লাইব্রেরি কাকলি পাঠাগার। শিশুদের সংগ্রহ করা ছবি ও কারুকাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হলো এই কচি-কাঁচার মেলার দুই কামরায়। উদ্বোধন করলেন পটুয়া কামরুল হাসান। এভাবে শিল্পবিতানের অর্থাৎ ছোটদের ছবি আঁকার প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল বা কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হলো।

তাই বলা যায়, দুটি ঘটনার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের শিশুদের চিত্রকলা চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। একটি ১৯৫৬ সালের খেলাঘর আয়োজিত শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনী এবং অন্যটি ১৯৫৮ সালে শিল্পবিতানের কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে।

পাঠ : ৪

শাহবাগে অবস্থিত গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে ছবি আঁকা শুরু হওয়ার প্রায় বছর দশেক পর ১৯৬০ সালের দিকে বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও সেখানে ছবি আঁকার ব্যবস্থা করলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। কচি-কাঁচার মেলার শিল্পবিতানের আদলেই। তৎকালীন শিশুকল্যাণ পরিষদ এই ছবি আঁকার স্কুলটি পরিচালনা করতেন। ছোটদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দেয়া ও শেখার বিষয়ে দেখভাল করতেন শিল্পী শফিকুল আমিন, শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল বাসেত। জয়নুল আবেদিন ছিলেন উপদেষ্টা। স্কুলের নাম ছিল শামসুন্নাহার শিশু কলাভবন। এখানে এসে শিশুরা মনের আনন্দে ছবি আঁকত। স্কুলটি এখনো শিশুদের জন্য ছবি আঁকার সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে স্কুলের নাম পাল্টে হয়েছে জয়নুল শিশু কলাভবন। চারুকলা অনুষদের শিক্ষকরা এটি দেখাশোনা করেন।

এই জয়নুল শিশু কলাভবনে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক শিশু এসে ছবি আঁকে সেই প্রথম থেকেই। শিশুদের আনন্দে ছবি আঁকার আবহ তৈরি করতে এই স্কুলটিরও অবদান অনেক। এখানকার শিশুদের আঁকা ছবি দেশে-বিদেশে অনেক সুনাম কুড়িয়েছে।

পাঠ : ৫

এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন সংগঠন এবং স্কুলগুলোতে শিশুদের ছবি আঁকা নিয়মিতভাবে হতে থাকে। বর্তমানে শিশু চিত্রকলা বিষয়টি বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার একটি বিশেষ বিষয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার পরিচালক রোকনুজ্জামান খান শিশু চিত্রকলাকে শিশুদের প্রতিভা বিকাশে ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম বিবেচনা করে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শিল্পী হাশেম খানের চিন্তা, অভিনব ও আনন্দদায়ক পদ্ধতির কারণে শিশুরা ছবি আঁকায় দারুণ মজা পেত। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের সন্তানকে ছবি আঁকা চর্চা করতে বাবা-মা ও অভিভাবকরাও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হাশেম খান ও রোকনুজ্জামান খানের চেষ্টায় নানারকম প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই শিশু চিত্রকলার প্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। তাই বলা যায়, শিল্পী হাশেম খান, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই এই দুজনের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় বাংলাদেশে শিশু চিত্রকলা বিষয়টি সংস্কৃতি চর্চার একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য এরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরামর্শ ও প্রেরণা সব সময় পেয়ে এসেছিলেন।

কাজ : 'জয়নুল শিশু কলাভবন' কোথায় অবস্থিত? এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তোমার খাতায় ৮ লাইন লেখ।

পাঠ: ৬

শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবি

১৯৭২ সালে কচি-কাঁচার মেলা ছোটদের দিয়ে ছবি আঁকিয়ে এক বিরাট কাজ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়ে সেই সময়ের শিশু-কিশোররা তিন শতাধিক ছবি আঁকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা কীভাবে নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শহর-বন্দর, স্কুল, কলেজ, মন্দির-মসজিদ সব ধ্বংস করে দেয়। এই পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা, চাষি, মজুরি কামার-কুমার, জেলে তথা সব বাঙালি। শিশু-কিশোররা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে জড়িত ছিল। অনেকে বন্দুক নিয়ে বড়দের সাথে যুদ্ধ করে।

মাত্র চার মাস আগে যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সে বিষয়ে নিজের চোখে যা দেখেছে তাই শিশুরা এঁকেছে। নিজেদের বাড়িতে ঘটা, নিজেদের গ্রামে, নিজেদের শহরে পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণ, বাজার-হাট, স্কুল-কলেজ, ঘরবাড়ি, বাগান জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া। আপনজনকে গুলি করে হত্যা করা, নির্যাতন ইত্যাদি ভয়াবহ ঘটনা, এমনি অনেক কিছু তারা ভুলতে পারেনি। সেসব অত্যাচারের বিষয় খুব মনোযোগ দিয়ে এঁকেছে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি, যারা রাতের অন্ধকারে পাক হানাদার বাহিনীর আস্তানায় অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের নাস্তানাবুদ করেছে। তাদের ছবিও এঁকেছে।

শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি

বাংলার দামাল ছেলেরা পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বীরের বেশে গ্রামে, শহরে, নিজেদের বাড়ি ফিরে এসেছে-সেসব ছবিও শিশুরা এঁকেছে।

শিশুদের আঁকা এই বিশেষ ছবি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের তিনশত ছবি নিয়ে কচি-কাঁচার মেলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই সময়ের অর্থমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

শিশুদের আঁকা এই ছবিগুলো ছোট-বড় দেশি-বিদেশি দর্শকদের মনে আলোড়ন তুলেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাছাই করা ৭০টি ছবি শিশুশিল্পীরা রোকনুজ্জামান দাদাভাইকে সঙ্গে নিয়ে দেখিয়েছিল গণভবনে। শিশুদের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হয়েছিলেন এবং শিশুদের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। শিশুদের সঙ্গে সেদিন বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন ঘণ্টা গল্পগুজব করে আনন্দে কাটান এবং যত্নের সঙ্গে তাদের খাবার পরিবেশন করেন।

কাজ : তোমার খাতায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লেখ।

পাঠ : ৭

পনেরো দিন চলেছিল এই প্রদর্শনী। প্রতিদিনই অনেক মানুষ ভিড় করে শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলো দেখতে আসত। এই তিনশত ছবি থেকে অনেক ভেবে-চিন্তে বাছাই করা হলো ৭০টি ছবি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও হাশেম খান এই ছবিগুলো বাছাই করেন লন্ডনে নিয়ে যাবার জন্য। জয়নুল আবেদিন শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি দেখে খুবই আবেগ-আপ্লুত এবং খুশি হন। সদ্য স্বাধীন দেশের শিশুশিল্পীদের ছবিতে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ ও পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, ধ্বংসলীলা এমন চমৎকারভাবে সততার সঙ্গে শিশুরা তুলে ধরেছে যে ছবির বিষয় ও আঁকার ভঙ্গিতে যেকোনো দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগুলো আরও ধারালো হয়। জয়নুল আবেদিন নিজের উদ্যোগে ছবিগুলো লন্ডনে নিয়ে যেতে চাইলেন এবং ভাবলেন, শুধু দেশের মানুষ দেখলেই চলবে না। আমাদের শিশুদের চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধ, সহজ-সরল ও সততার সঙ্গে রং, রেখায় প্রতিটি ছবিতে তারা তুলে ধরেছে। বিশ্ববাসীকে তা দেখাতে হবে। এতে দুটো কাজ হবে- প্রথমটি, বাংলাদেশের শিশুরা যে, প্রতিভাবান, তারা কত অকপটে চমৎকার ও সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, সেটা জানানো হবে। দ্বিতীয়টি হলো- শিশুদের সত্য ও সহজ প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাক হানাদার বাহিনীর দানবীয় অত্যাচার-নির্যাতন, মানুষ হত্যা। আরও জানবে বাংলার মানুষের সাহস ও মনোবল, যার মাধ্যমে নয় মাস মরণপণ যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের পরাজিত করে তারা দেশের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।

পাঠ: ৮

এই ৭০টি ছবিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল আঁকিয়ে শিশুরা। বঙ্গবন্ধু যখন জানলেন শিল্পাচার্য ছবিগুলো লন্ডনে নিয়ে যাবেন প্রদর্শনী করতে, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন- আমি এখনই লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিচ্ছি। তারা সব রকম সহযোগিতা করবে। তিনি বললেন, শিশুদের আঁকা এই ছবিগুলো বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের শিশুরাও যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবের খবর বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে, এটা আমাদের জন্য বিশাল অর্জন। ১৯৭২ সালের ২২ জুন। লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে বেশ জাঁকজমকভাবেই আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবির প্রদর্শনী। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর লন্ডনের ছেলে, বুড়ো ও মহিলারা প্রতিদিন ভিড়

করে দেখতে আসেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, বিবিসি ও অন্যান্য মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিশুশিল্পীদের প্রশংসা করে খবর বের হয়, আলোচনা হয়। বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠায় খবর-ছবি ছেপে বিশেষ সংখ্যা বের করে। শিশুশিল্পী দিনার আঁকা ছবি দিয়ে বড় পোস্টার ছাপা হয়। প্রদর্শনী চলার সময় তা বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন হয়, তা বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য তহবিলে পাঠানো হয়। এক মাস দশ দিন চলেছিল এই প্রদর্শনী। শুধু লন্ডনেই নয়, পরে এডিনবরা শহরে এবং কানাডাসহ আরও ৮টি কমনওয়েলথ দেশে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা এই ছবিগুলো রাষ্ট্রের দূত হিসেবেই এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

কাজ : বাংলাদেশের শিশু-কিশোররা ছবি আঁকার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরেছিল। আর কী কী বিষয়ের মাধ্যমে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরতে পারি। ৫-৬ জনের দল গঠন করে প্রতি দল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এ সম্পর্কে খাতায় লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

১. সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।

(ক) বাংলাদেশের ছবি আঁকায় বা শিল্পকলা চর্চায় কার অবদান অনেক– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ/ সত্যজিৎ রায়/ জয়নুল আবেদিন/ শহীদুল্লা কায়সার।

(খ) শিল্পবিতান ছিল– লেখাপড়া করার স্কুল/ খেলাধুলার স্কুল/ছবি আঁকার স্কুল/ গানবাজনা শেখার স্কুল।

(গ) 'কচি-কাঁচার মেলা' সংগঠন– বুদ্ধিজীবীদের জন্য কাজ করে/ শিশু-কিশোরদের জন্য কাজ করে/ বড়দের জন্য কাজ করে/ বৃদ্ধদের জন্য কাজ করে।

(ঘ) ১৯৭২ সালে শিশু-কিশোররা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে– ৩৫০টি ছবি আঁকে/ ৪০০টি ছবি আঁকে/ ৩০০টির বেশি ছবি আঁকে/ ২০০টি ছবি আঁকে।

(ঙ) শিশু-কিশোররা বঙ্গবন্ধুকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল বাছাই করা – ১০০টি ছবি/ ৭০টি ছবি/ ৩০০টি ছবি/ ৫০টি ছবি।

(চ) ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিশুদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়– নিউইয়র্ক শহরে/ লন্ডন শহরে/ প্যারিস শহরে/ টরেন্টো শহরে।

২. খুব সংক্ষেপে ২ থেকে ৫টি বাক্যের মধ্যে উত্তর লেখ।

(ক) ছবি আঁকার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম কী? এটি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(খ) ছবি আঁকার প্রথম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী কারা ছিলেন?

(গ) ছবি আঁকা শিখলে কী কী সামাজিক কাজে তার প্রয়োজন হয়?

(ঘ) ছোটদের ছবি আঁকার প্রথম প্রদর্শনী ও স্কুল কোনটি?

(ঙ) কচি-কাঁচার মেলা শিশুদের ছবি আঁকার জন্য কী কী কাজ করেছিল?

(চ) জয়নুল শিশু কলাভবন কোথায়, কবে শুরু হয়েছিল?

(ছ) শিশুদের ছবি আঁকা সংগঠিতভাবে শুরু করেন কোন শিল্পী?

৩. শিশুরা মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে কোথায় কীভাবে প্রদর্শনী করেছিল? সংক্ষেপে লেখ।

৪. লন্ডনে কে শিশুদের ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন? কোথায় প্রদর্শনী হয়? ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫. ২ থেকে ৫ লাইনে সংক্ষেপে জবাব লেখ।

(ক) শিশুরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কতগুলো ছবি এঁকেছিল? কতগুলো ছবি নির্বাচন হলো প্রদর্শনীর জন্য?

(খ) শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধক কে ছিলেন?

(গ) শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবিগুলোর বিষয় নিয়ে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

(ঘ) লন্ডনে কার কার আগ্রহে প্রদর্শনীটি হতে পেরেছিল?

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প

সোনারগাঁ লোকশিল্প ও কারুশিল্প যাদুঘর

এই অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা

- লোকশিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও উদাহরণ উল্লেখ করতে পারব।
- কারুশিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও উদাহরণ দিতে পারব।
- বাংলাদেশের লোকশিল্পের বর্ণনা করতে ও উদাহরণ উল্লেখ করতে পারব।
- বাংলাদেশের কারুশিল্পের বর্ণনা করতে ও উদাহরণ দিতে পারব।

পাঠ : ১

লোকশিল্পের ধারণা

আদিম মানুষদের ছবি আঁকার কথা আমরা জানি। আদিম গুহাবাসী মানুষদের সবাই যে ছবি আঁকতে পারত তা কিন্তু নয়। তবে কেউ কেউ বেশ ভালো আঁকত। তাদের দিয়েই ছবিগুলো আঁকান হত। পরে তারা মাটি দিয়ে পাত্র, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানাতেও শিখেছিল। তাদের এই ছবি, পাত্র বা মূর্তি তৈরি হত সহজ-সরলভাবে। যেমন : আদিম মানুষদের কেউ কেউ ভালো ছবি আঁকত বা মূর্তি গড়তে পারত, লোকশিল্পীরাও তেমনি। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামে-গঞ্জে কিছু লোক ভালো ছবি আঁকতে বা পুতুল বানাতে পারত। যে সহজ রীতিতে তারা ছবি আঁকত বা পুতুল বানাত তা শিখে নিয়েছিল তাদের সন্তানেরা। তাদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা আবার বাবা-কাকাদের কাছে বসে শিখেছে কীভাবে আঁকতে বা গড়তে হয়। এভাবে একই রীতি-নীতিতে হাজার হাজার বছর ধরে লোকশিল্প তৈরি হয়ে আসছে। এ শিল্প সাধারণ মানুষের মনে আনন্দ যোগায়। তাই বলা হয়, 'লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি।' পৃথিবীর সবখানেই লোকশিল্পের উপকরণ সাধারণ। উপকরণ অর্থ যা দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা হয়। যেমন- মাটি, কাঠ, কাপড়, সুতা, ধাতব দ্রব্য, পাতা, বাঁশ, বেত প্রভৃতি দিয়ে সব দেশেই কিছু কিছু অভিন্ন লোকশিল্প তৈরি হয়। সেগুলো হচ্ছে পোশাক, আসবাব, লোক অলঙ্কার, লোক বাদ্যযন্ত্র, সূচিকর্ম, পুতুল, বাসন-কোসন ইত্যাদি।

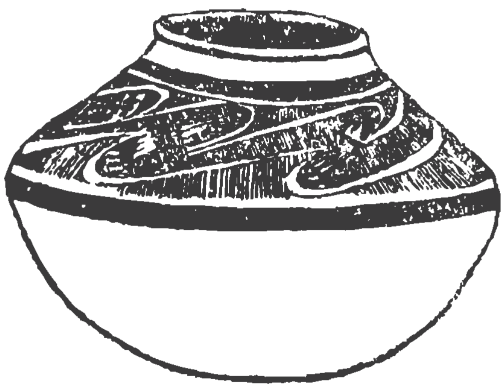

ব্রজিলের উইটোটোদের সিগন্যাল ড্রাম

বাংলাদেশের সখের হাঁড়ি

কাজ : ১. চার-পাঁচজনের দল তৈরি করে 'লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি'-এ কথাটির ব্যাখ্যা লেখ। প্রতি দল থেকে একজন শ্রেণিতে পড়ে শোনাও।

২. লোকশিল্পের সাথে আদিমশিল্পের মিল ও অমিল কোথায়, অনুমান করতে পার?

নতুন শিখলাম : লোকশিল্প, লোকশিল্পী, উপকরণ।

পাঠ : ২

বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয়

আমাদের বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন উপলক্ষে মেলা বসে। শহরেও আজকাল এমন মেলার আয়োজন হয়। তোমরা নিশ্চয়ই কখনও না কখন এমন মেলায় গিয়েছ। যেমন : বাংলা নববর্ষে বৈশাখী মেলা কিংবা পৌষ সংক্রান্তির মেলা। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উৎসব যেমন- ঈদ, পূজা, মহররম, রথযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষেও মেলার আয়োজন করা হয়। এসব মেলাতে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল রঙের এর বিভিন্ন পুতুল, পাট, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাব ও খেলনা, মাটির তৈরি বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায়। খেলনাগুলো তৈরি হয় কাঠ অথবা মাটি দিয়ে। মাটি টিপে টিপে নানারকম হাতি, ঘোড়া, মানুষ ও পুতুল বানানো হয়। কাঠের ছোট-বড় হাতি, ঘোড়া ও মানুষের পুতুলও তৈরি করা হয়। তারপর এই মাটি ও কাঠের তৈরি খেলনা ও পুতুলগুলোকে উজ্জ্বল লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ, কালো ইত্যাদি নানা রঙে খুবই আকর্ষণীয় করে রং করা হয়।

মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের পুতুল

হাতি, ঘোড়া কাঠের পাটাতনের উপর বসিয়ে নিচে চারটি চাকা লাগিয়ে দেয়া হয়, যাতে এগুলো খেলনা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও পাট দিয়ে বিভিন্ন রকম শিকা, ফ্লোরম্যাট, টেবিলম্যাট ইত্যাদি তৈরি করে রং করা হয়। বাংলার গ্রামের মেয়েরা তাদের অবসর সময়ে খুব যত্নকরে রঙিন সুতার সেলাই দিয়ে মনোরম নকশা বা বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে এক ধরনের কাঁথা তৈরি করে। যার নাম নকশিকাঁথা। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প মিশে থাকে সেসব ছবিতে। এসব পুতুল, পাত্র, খেলনা ও নকশিকাঁথা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। এছাড়াও শখের হাঁড়ি, লক্ষ্মীসরা, পটচিত্র, পুঁথিচিত্র, পিঁড়িচিত্র, দেয়ালচিত্র, নকশি পাখা, নকশি পিঠা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র-এগুলো সবই বাংলাদেশের লোকশিল্প নামে পরিচিত।

বিভিন্ন ব্রত, অনুষ্ঠানে ও পূজায় ঘরে এবং উঠানে আলপনা আঁকা বাংলাদেশের এক অতি প্রাচীন রীতি। এটিও বাংলার লোকশিল্প। এখন বিয়ে, গায়ে হলুদ, একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে বা রাস্তায় যে আলপনা আঁকা হয় তা সেই প্রাচীন লোকরীতিরই ধারাবাহিকতা।

আরও বিভিন্ন প্রকার লোকশিল্প আমাদের দেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু কিছু কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও এখনো যা টিকে আছে তা অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগেকার প্রচলিত শিল্পের ধারা। ধারা মানে কোনো বিশেষ রীতি বা নিয়ম। দেশে বা বিদেশের অন্যান্য শিল্পের ধারা থেকে আমাদের লোকশিল্পের ধারা একেবারেই আলাদা।

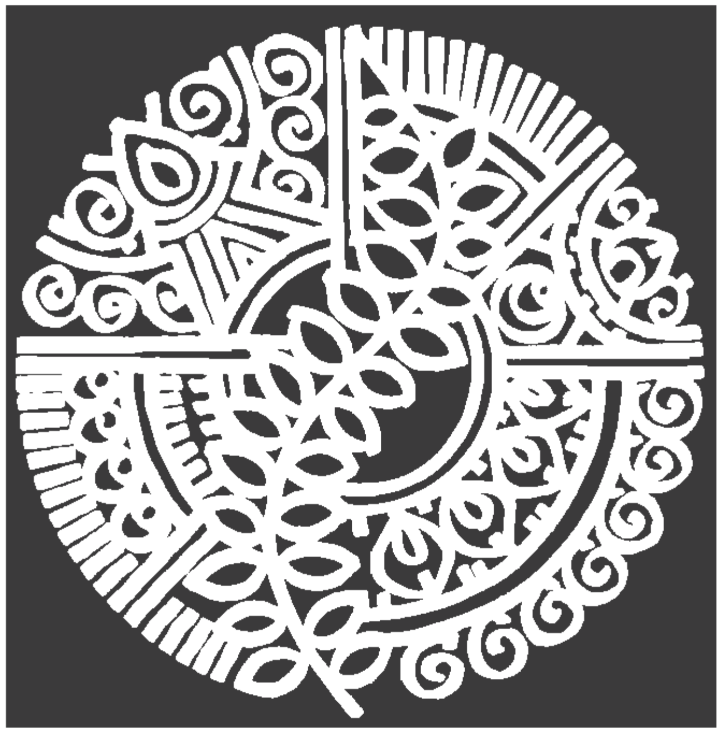

আলপনা

বাংলাদেশের লোকশিল্পের যে ধারা, তা হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। এদেশে একসময় কৃষিকাজ করেই মানুষ জীবন ধারণ করত। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর গোয়ালভরা গরু নিয়ে তাদের ছিল সুখের জীবন। তাই নিজেদের আনন্দ ও শখ মেটানেরা জন্য এবং অন্যদের আনন্দ দেবার জন্য লোকশিল্পের প্রসার ঘটে।

মাটি, পুরনো কাপড়, কাঠ, বাঁশ, বেত, সোলা, তাল ও খেজুর পাতা প্রভৃতি সাধারণ উপকরণে তৈরি হয় লোকশিল্প। অতি সাধারণ হলদি, খড়িমাটি, নীল আবীর, সিন্দুর, কাঠ কয়লা প্রভৃতি রং দিয়েই তৈরি হয় এই শিল্প।

এ সমস্ত লোকশিল্প তৈরি করতে নকশা হিসেবে একই চিত্রের বারবার ব্যবহার করা হয়। এই বারবার ব্যবহার করা চিত্রকে বলা হয় মটিভ বা মুদ্রা। বাংলাদেশের লোকশিল্পে বহুল ব্যবহৃত মটিফ হচ্ছে-পদ্ম, কলকা, চন্দ্র, সূর্য, হাতি, পাখি, পানপাতা ইত্যাদি। হাজার হাজার বছর ধরে এ শিল্প মিশে আছে আমাদের জীবনে। দেশের বাইরেও আমাদের জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে আমাদের লোকশিল্প।

কাজ : ১. পাঁচ-ছয়জনের দল তৈরি করে প্রতিদল এই পাঠের মধ্যে যেসব লোকশিল্পের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার তালিকা কর। দেখা যাক, কোন দল সবচেয়ে বেশি লোকশিল্পের নাম লিখতে পারে।

২. নিজের বাসা বা বাড়িতে সংগৃহীত কয়েকটি লোকশিল্প পরবর্তীক্লাসে এনে দেখাবে।

নতুন শিখলাম : শিল্পধারা, নকশিকাঁথা, উপকরণ, মটিফ।

পাঠ : ৩

কারুশিল্পের ধারণা

আমরা প্রতিদিন অনেক রকম জিনিসপত্র বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। এ সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসে সৌন্দর্য আরোপের জন্য নানা রকম কারুকাজ করা হয়। নকশা করা এসব ব্যবহার সামগ্রীকে কারুশিল্প বলে।

এখন থেকে আনুমানিক কুড়ি বা পঁচিশ লাখ বছর আগে আদিম মানুষেরা ধারালো পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল। এসব পাথুরে অস্ত্র, গাছের ডাল দিয়ে তৈরি কাঠের শাবল ও কাঠের লাঠি ছিল মানুষের প্রথম ব্যবহার্য হাতিয়ার।

বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্প

মাটির পাতিলে রং দিয়ে নকশা করে যখন শখের হাঁড়ি হয়, তখন লোকশিল্প, তার আগে যখন কুমার পাতিল বানায়, তখন কারুশিল্প

তবে এখন থেকে ১৭,০০০ বা ১২,০০০ বছর আগে ফ্রান্সে একদল শিকারি মানুষ বাস করত, যারা হরিণের শিং ও হাতির দাঁত দিয়ে হাতিয়ার বানাত। হাতিয়ারগুলোর উপর তারা আবার সুন্দর ছবি আঁকত বা খোদাই করত। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কোনো জিনিসের উপর খোদাই করে, আঁচড় কেটে বা অন্য কোনো উপায়ে নকশা বা কোনো আকৃতি ফুটিয়ে তোলাকে বলে কারুকাজ বা অলংকরণ। মূলত ব্যবহার্য বস্তুতে অলংকরণের সূত্রপাত সেই আদিম শিকারি মানুষেরাই শুরু করেছিল।

পুরনো পাথরের যুগের শেষদিকে মানুষ মাছের মেরুদণ্ডের হাড়, ঝিনুক, হরিণের দাঁত ইত্যাদি গেঁথে গলার হার তৈরি করে করত। তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। গুহার দেয়ালে ছবি আঁকার জন্য পাথরের তৈরি পিরিচ আকৃতির এক ধরনের প্রদীপ তারা ব্যবহার করত। নতুন পাথরের যুগে মানুষ মাটির পাত্র তৈরি করতে শিখল। এভাবেই সভ্যতা এগিয়েছে আর সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন উপাদানে নতুন নতুন ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করতে শিখেছে এবং তাতে বিভিন্ন কারুকাজ বা অলংকরণ করে শিল্পরূপ দিয়েছে।

কারুশিল্পের অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয় সহজ উপকরণ বা হাতিয়ার। কখনও কখনও তা করা হয় শুধু হাতে। তাই বলা যায়, যখন কোনো ব্যবহার্য সামগ্রীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাতে সহজ সাধারণ হাতিয়ারের মাধ্যমে কারুকাজ করা হয়, তখন তাকে কারুশিল্প বলে। যেমন : একটি সাধারণ কাঠের দরজা একটি ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু তবে সেটা কারুশিল্প নয়। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় সাধারণ বস্তুটি যখন আমরা সুন্দর রূপে দেখতে চাই, তখন তাকে ফুল, লতা, পাতা বা অন্য কোনো নকশা দিয়ে কারুকাজ করা হয়। তখন এই নকশা বা কারুকাজ করা দরজাটি হয়ে যায় কারুশিল্পের নিদর্শন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প বিকাশ লাভ করেছে। ভূ-প্রকৃতি, মানুষের রুচি, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপাদান, অধিবাসীদের জীবিকা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

কাজ : ১ তোমার বাড়িতে বা বাসায় ব্যবহার করা হয় এই রকম পাঁচটি কারুশিল্পের নাম খাতায় লেখ এবং পাশে তার ছবি আঁক।

নতুন শিখলাম : কারুশিল্প, হাতিয়ার, অলংকরণ, কারুকাজ।

পাঠ : ৪

বাংলাদেশের কারুশিল্পের পরিচয়

লোকশিল্পের মতো বাংলাদেশের কারুশিল্পও আমাদের দেশের মানুষের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে। আমাদের প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায় এমন কারুশিল্পের উপাদান হচ্ছে বাঁশ, বেত ও কাঠ। তাই বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুশিল্প আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করেছে এবং এর শিল্পগুণ সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত। তাছাড়া মাটির তৈরি বিভিন্ন বাসনপত্র এবং তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র আমাদের কারুশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

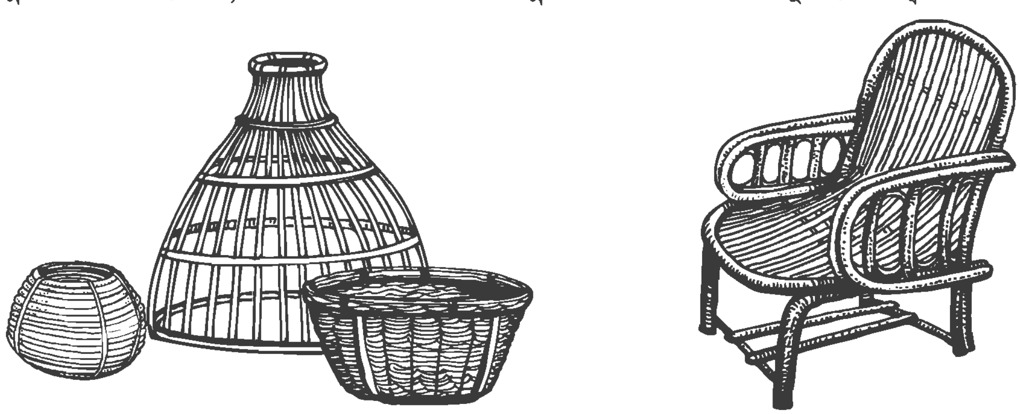

বাঁশ ও বেতের তৈরি কারুশিল্প

বাঙালি মেয়েদের সাজ-সজ্জায় অলংকারের ব্যবহার অতিপ্রাচীন। চমৎকার নকশা করা সোনা ও রূপার নানা ধরনের অলংকারও সুন্দর কারুশিল্প। বাংলাদেশের আদিবাসীদের ব্যবহার করা বিভিন্ন অলংকারও আমাদের কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাছাড়া তাঁতের শাড়ি-বিশেষ করে জামদানি, টাঙ্গাইল শাড়ি, রাজশাহী সিল্ক ও কাতান শাড়ি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কারুশিল্প হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। মাটির হাঁড়ি, পাতিল, কলস, সোরাই, পিতল ও কাঁসার থালা, গ্লাস, কলসি, গামলা, চিলমচি, পানের বাটা থেকে শুরু করে লোহার তৈরি দা, কুড়াল, খন্তা, কাস্তে, কড়াই, জাঁতী ইত্যাদি সবকিছুর গায়েই আঁচড় কেটে বা খোদাই করে ফুল, লতা, পাতা, পাখি ও নানা ধরনের নকশা আঁকা হয়। এগুলো সবই বাংলাদেশের কারুশিল্প।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে চারপাশেই কারুশিল্পের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের যানবাহনের জন্য ব্যবহার করা নৌকা, পালকি, রিকশাতেও সুন্দর কারুকাজ করা হয়। নৌকার চেহারা ও গড়নের মধ্যে যেমন শিল্পনৈপুন্য আছে, তেমনি কাঠ খোদাই করে নৌকার গায়ে বিভিন্ন কারুকাজ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কারণে নৌকার নামও হয় নানা রকম। যেমন- গয়না নৌকা, সাম্পান, বজরা, পানসি নৌকা, কোশা, সারঙ্গা, দীপ ইত্যাদি। প্রতিটি নৌকাই শিল্পগুণে অনন্য। পালকির গায়েও বিভিন্ন রকম কারুকাজ করা হয়। আবার প্রতিদিন আমরা যে রিকশাতে চড়ি, তাও একটি আকর্ষণীয় কারুশিল্প। বাঁশ, কাপড় দিয়ে এবং প্লাস্টিকের ফুল, পাতা, পাখির নকশা কেটে সেলাই করে রিকশাকে সুন্দর কারুকার্যময় করা হয়। অন্যদিকে ধনবান গৃহস্থ বাঙালি দ্বারা বিকাশ লাভ করেছে আমাদের কাঠের তৈরি কারুশিল্প। এগুলো দারুশিল্প নামে পরিচিত। কাঠের কারুকাজ করা খাট, পালঙ্ক, কাঠের বেড়া, সিংহ দরজা, সিন্দুক, পালকি, নৌকা ইত্যাদি কারুশিল্পরূপে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। অতীতের সেই সমৃদ্ধ কাঠের কারুশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আমাদের জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় যাদুঘরে গেলে এ ধরনের অনেক রকম কারুশিল্পের নিদর্শন তোমরা দেখতে পাবে।

এছাড়া বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন আসবাব, চেয়ার, টেবিল, মোড়া, খাট, সাজি, ডালা, কুলা, মাছ ধরার চাঁই, পলো, ওঁচা, চোঁচ এবং আদিবাসীদের তৈরি নানা রকম নকশা করা কাপড়, চাদর, কম্বল, বাঁশ ও বেতের টুকরি, মাথাল, শাঁখার চুড়ি, ঝিনুকের বোতাম, হাড়ের চিরুনি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের কারুশিল্পের সমৃদ্ধ ভূবন।

কাজ : ১. তোমার বাড়িতে ব্যবহার করা হয় এই রকম পাঁচটি কারুশিল্পের নাম খাতায় লিখ এবং পাশে তার ছবি আঁক।

নতুন শিখলাম : দারুশিল্প।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লোকশিল্পকে বলা হয় সাধারণ লোকের জন্য-

ক. আধুনিক শিল্পীদের সৃষ্টি খ. বিখ্যাত শিল্পীদের সৃষ্টি

গ. সাধারণ লোকের সৃষ্টি ঘ. বাউল শিল্পীদের সৃষ্টি

২. নকশিকাঁথা তৈরি করেন-

ক. বাংলার গ্রামের মেয়েরা খ. বাংলার তাঁতি সম্প্রদায়

গ. বাংলার পটশিল্পীরা ঘ. বাংলার কুমার সম্প্রদায়

৩. লোকশিল্প তৈরির জন্য নকশা হিসেবে একই চিত্রের বারবার ব্যবহারকে-

ক. ‘প্রতীক’ বলে খ. ‘মোটিফ’ বলে

গ. ‘আলপনা’ বলে ঘ. ‘উপকরণ’ বলে

৪. ব্যবহার্য বস্তুকে সুন্দর করার জন্য কারুকাজ করাকে বলে-

ক. চারুশিল্প খ. আদিম শিল্প

গ. নান্দনিক শিল্প ঘ. কারুশিল্প

৫. বাংলাদেশের কারুশিল্পের অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে-

ক. মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে খ. জাতীয় যাদুঘরে

গ. বরেন্দ্র যাদুঘরে ঘ. জয়নুল সংগ্রহশালায়

৬. নিচের সামগ্রীগুলো থেকে লোকশিল্প ও কারুশিল্পকে আলাদা কর।

লক্ষ্মীসরা, নকশি পিঠা, নকশি খাট, নকশি পাখা। নকশা করা কাঠের বেড়া, রিকশা, নকশিকাঁথা, গয়না নৌকা, সাজি, ডালা, মাটির পুতুল।

সৃজনশীল প্রশ্ন

অন্তরা, সৌরভ ও মিলা বাংলা নববর্ষের মেলায় যায়। মেলায় বিভিন্ন রঙের বাহারি খেলনা দেখতে দেখতে অন্তরা কয়েকটি মাটির পুতুল কিনে। মিলা একটি পাটের শিকা কিনে। কিন্তু সৌরভ কিনল রঙিন সুতা। কারণ বাড়িতে তার মা-চাচি-ফুফুরা কাঁথা তৈরি করে তাতে এই রঙিন সুতো দিয়ে বিভিন্ন ছবি ও নকশা ফুটিয়ে তোলে।

ক) আমাদের বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কী বসে?

খ) 'নকশিকাঁথা' নামটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ) উদ্দীপকে মেলার বাহারি খেলনাগুলো আমাদের শিল্পের কোন বিশেষ দিকটি নির্দেশ করে, ব্যাখ্যা দাও।

ঘ) 'উদ্দীপকের তিনজনের মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা সংরক্ষিত হচ্ছে'-বিশ্লেষণ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কারুশিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

২। লোকশিল্প সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম, উপকরণ ও মাধ্যম

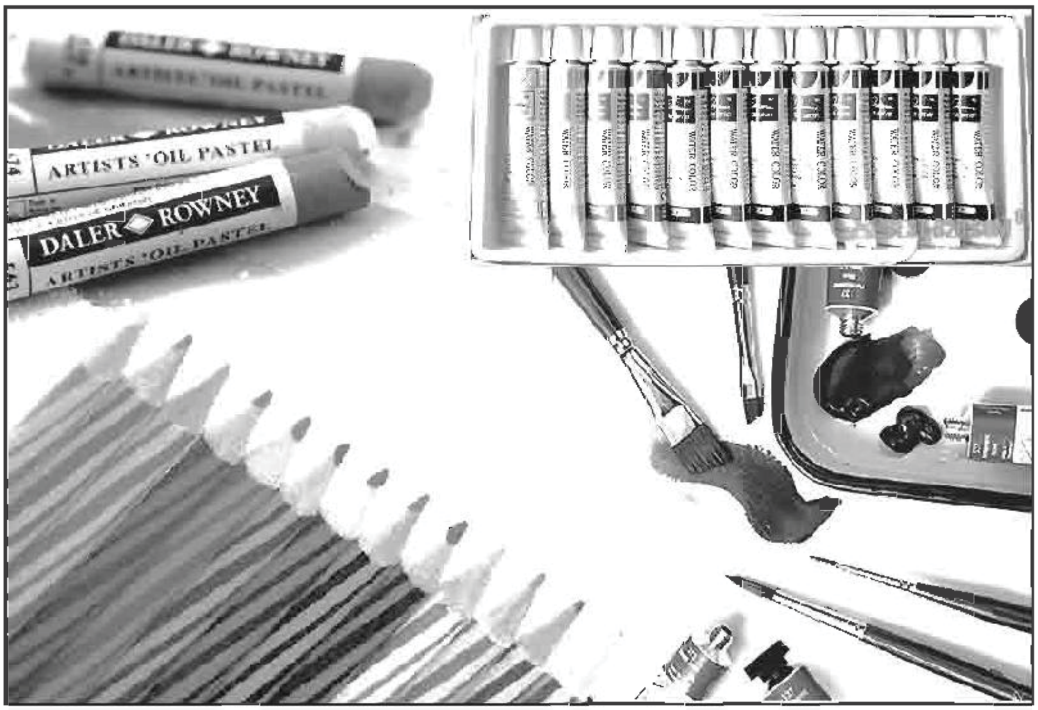

ছবি আঁকার বিভিন্ন উপকরণ

এই অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা

- ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণসমূহের নাম ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যমের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ: ১

ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম

ছবি আঁকতে আমরা সবাই পছন্দ করি। একেবারে যে ছোট্ট শিশু, তার হাতে যদি একটা কলম বা পেনসিল দেওয়া হয় তবে সেও কাগজে বা দেয়ালে আঁকিবুকি করে কিছু আকার-আকৃতি তৈরি করবে- সেটাই তার ছবি। তোমরাও এতদিন অনেক ছবি এঁকেছ, সেসব ছবিতে ঘর-বাড়ি, মানুষজন, নদী-নৌকা, মাছ-পাখি, সবই এঁকেছ। ইচ্ছেমতো তাতে রংও করেছ। সেসব ছবি নিশ্চই অনেক সুন্দর হয়েছে। তবে সঠিক ও নিখুঁতভাবে আঁকার জন্য আমাদের কিছু নিয়মকানুন জানতে হবে। সেগুলো মেনে ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আঁকলে ছবি সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়। সে সাথে নিজের চারপাশের প্রকৃতি, জীবজগৎ ও প্রতিদিনের ব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রীকে গভীরভাবে দেখার ও আঁকার কায়দা রপ্ত করা প্রয়োজন।

অনুপাত ও আলোছায়া ঠিক রেখে ছবি আঁকতে হয়

ছবি আঁকার জন্য বিষয়স্তুকে অর্থাৎ যা আঁকতে চাই তা যথাসম্ভব সঠিক আকার ও আকৃতিতে ছবিতে তুলে ধরতে হবে। প্রথমে তাই সঠিক ও সুন্দরভাবে বিষয়বস্তুর রেখাচিত্র অর্থাৎ ড্রইং করে নিতে হবে। তারপর তাতে যথাযথভাবে বিভিন্ন রং প্রয়োগ করে পরিপূর্ণতা দিতে হবে। কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করে আমরা সহজভাবে ছবি আঁকতে পারি। যেমন : আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং, দূরত্ব ও অনুপাত ঠিক রেখে বিষয় সাজানো, ছবিতে আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগ এবং রং ব্যবহারে দক্ষতা।

আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং

আমাদের চারপাশে তাকালে আমরা কত কিছু দেখতে পাই। গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষ, পশু-পাখি, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, চেয়ার-টেবিল আরও কত কি! প্রত্যেকের আকার-আকৃতি, চেহারা, গড়ন কিন্তু আলাদা-আলাদা। যেমন : গাছ পালার মধ্যে কোনোটা ছোট তো কোনোটা বড়। কোনোটা মোটা তো কোনোটা ইয়া লম্বা। বটগাছের সাথে

তালগাছের কোনো মিল নেই। আবার মানুষ সবাই দেখতে এক রকম নয়। কেউ মোটা কেউ পাতলা। কেউ বেঁটে তো কেউ লম্বা। এভাবে পশু-পাখি, আসবাবপত্র, বাসন-কোসন সবকিছুর আদল বা আকৃতি কিন্তু আলাদা। আর তাই যাই আঁকবে তা ভালো করে দেখে নিতে হবে, আকার ও আকৃতি কেমন।

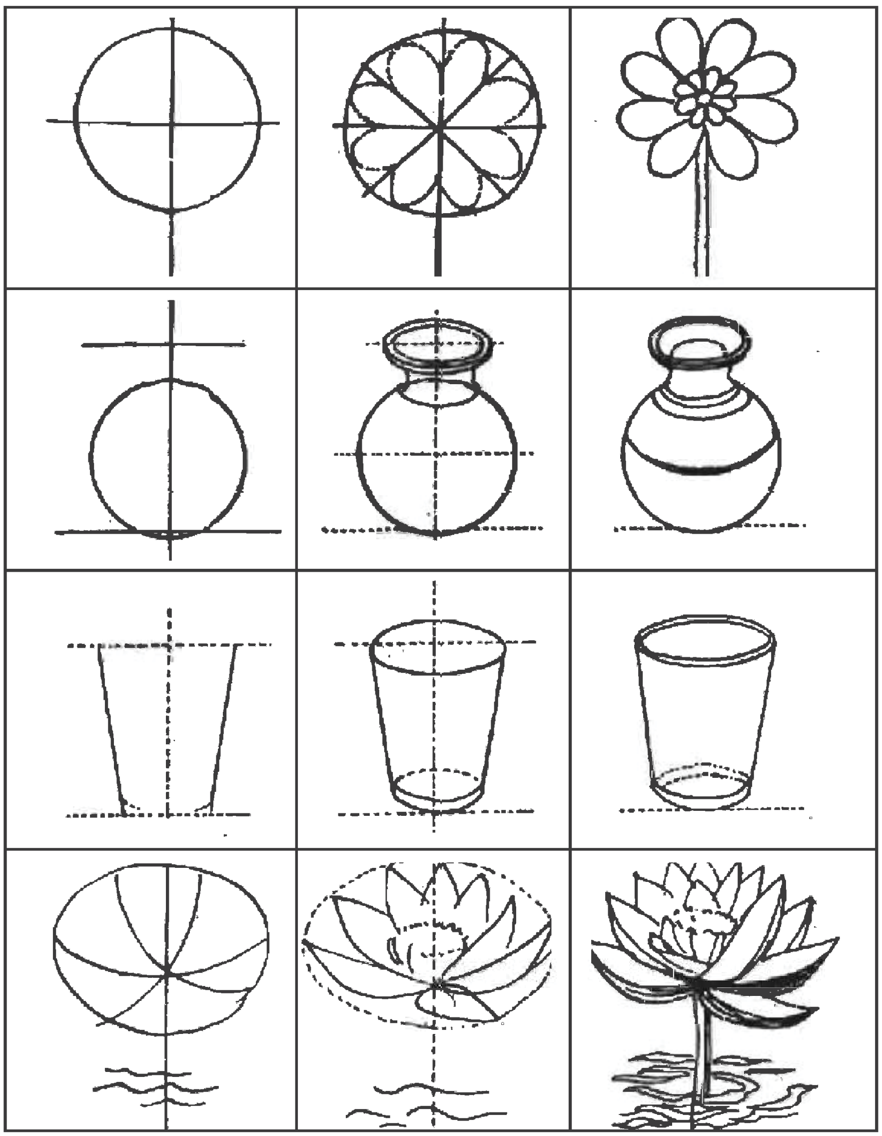

আদল বা আকৃতি ঠিক করে নিয়ে ধীরে ধীরে মূল ড্রইং করা অনেক সহজ।
ওপরের ছবিগুলো পর পর ভালোভাবে দেখে, বুঝে এভাবে আঁকার চেষ্টা কর।

তার গঠন ও রূপ গোলাকার, লম্বাটে, তিন কোণা, চারকোণা নাকি চ্যাপ্টা। ভালো করে দেখলে বুঝা যায় প্রকৃতির সব জিনিসই তিনটি আকৃতি বা আদলের মধ্যে ধরে রাখা যায়। এ তিনটি আকৃতি হলো গোল আকৃতি, চার কোণা আকৃতি ও তিন কোণা আকৃতি। যে জিনিস আঁকবে বা যার ছবি আঁকবে তার আদল ও রূপ এই তিনটি আকৃতির কোনটির সাথে মিলে যায় তা ঠিক করে ধীরে ধীরে ড্রইং শুদ্ধ করে নিতে হবে।

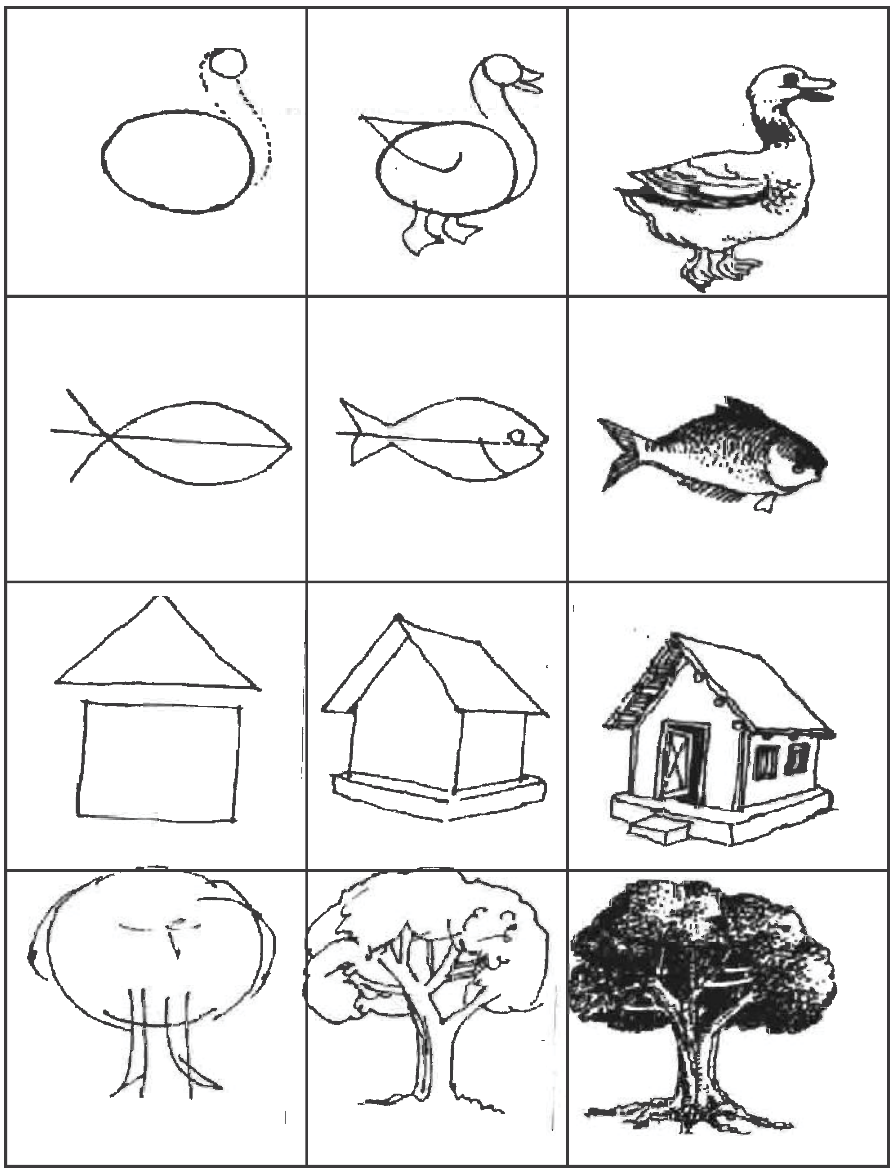

গোলাকার, তিন কোণা ও চার কোণা ঘরের যেকোনো একটির আকৃতির সঙ্গে
আমাদের আশেপাশের প্রায় সব জিনিসের গঠন মিলে যায়।

এ বইয়ের কয়েকটি ছবি এঁকে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ছবিগুলো ভালোভাবে দেখে এবং যখনই কিছু আঁকতে যাবে তা মোটা, সরু, কিংবা গোলাকার, চার কোণা না তিন কোণা ঘরের মধ্যে ধরা যায় তা ভালো করে দেখে বুঝে নিয়ে ড্রইং করবে।

নতুন শিখলাম : রেখাচিত্র, আদল।

পাঠ : ২

বিষয় সাজানো

যে বিষয়ে ছবি আঁকবে তা নিয়ে প্রথমে একটু ভেবে নিতে হবে। যদি কোনো কিছু দেখে আঁকতে হয়, তবে বিষয়বস্তু ভালো করে দেখে নিয়ে কাগজে তা কেমন করে সাজাবে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। সেটা হতে পারে একটি বিড়ালের ছবি, হতে পারে একটি পাতিল বা একটি গ্রামের দৃশ্য। একটিমাত্র বিষয় যদি হয় অর্থাৎ ধরা যাক একটি ফুলের ছবি অথবা একটি মুরগির ছবি আঁকা হবে। সে ক্ষেত্রে ছবিটি এমনভাবে আঁকতে, হবে যাতে ড্রইং করার পর এর কোনো অংশ কাগজের শেষ সীমানায় চলে না আসে। উপরে, নিচে, ডানে, বায়ে কাগজে কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়ে মূল ড্রইংটি করতে হবে। যাতে এটি কাগজ অনুযায়ী খুব বড় বা খুব ছোট না হয়। আবার যদি বিষয় হয় গ্রামের দৃশ্য, তবে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে কেমন করে সাজালে ভালো লাগবে। কারণ এখানে অনেক বিষয় মিলে একটি বিষয়। ঘরবাড়ি আছে, গাছপালা আছে, নদীর পাড়ে ফসলের মাঠ, তীরে নৌকা বাঁধা বা নদীতে ভাসমান পালতোলা নৌকা। আছে মানুষ ও পাখি। এ সবকিছু মিলেইতো গ্রাম। ছবিটি চার-পাঁচরকমভাবে সাজিয়ে দেখে নেয়া যায়, কোনটি বেশি সুন্দর লাগে। প্রয়োজনে দু-একটি বিষয় কাটছাঁট করাও যেতে পারে। অর্থাৎ আঁকিয়ে ছবিটির বিষয় তার দৃষ্টিতে যেভাবে সুন্দর মনে হবে সেভাবেই সাজাবে। কাগজে বিষয়বস্তুর সাজানো সুন্দর না হলে ছবিটি আকর্ষণীয় হবে না। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাগজে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে ড্রইং করে নিতে হবে।

দূরত্ব ও অনুপাত

এবার দূরত্ব ও অনুপাত সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাক। এর আগে গ্রামের দৃশ্য সাজানোর আলোচনা করা হয়েছে। তাতে নদী, গাছপালা, মানুষ ও নৌকা রয়েছে। এখন মানুষ অনুপাতে নৌকা কত বড় হবে, তার সাথে গাছ থাকলে সেটা কত বড় হওয়া প্রয়োজন বা গাছের নিচে গরু কিংবা মানুষ থাকলে সেটা কত ছোট হবে তার সঠিক ধারণা থাকতে হবে। ছবিতে ছোট ও বড় বস্তুর তারতম্যকে অনুপাত বলে। একজন মানুষ আঁকলে শরীরের তুলনায় মাথা কতটুকু হবে বা হাত কতটুকু লম্বা হবে, পুরো শরীরে কোমর থেকে পা পর্যন্ত কতটুকু এবং কোমর থেকে কাধ পর্যন্ত কতটুকু সে অনুপাত সঠিক রেখে ছবি আঁকতে হয়। সে কারণে ভালোভাবে বিষয়বস্তু দেখে নিতে হবে। আবার নদীতে তিনটি নৌকা থাকলে বা একাধিক মানুষ থাকলে সামনের নৌকা থেকে পিছনের নৌকা এবং সামনের মানুষ থেকে পিছনের মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি কতটুকু দূরে তা ঠিকমতো তুলে ধরতে হবে। কাছেরটির অনুপাতে দূরেরটি কতটুকু ছোট হবে তা ঠিকমতো আঁকতে পারলেই ছবির মধ্যে দূরত্ব বুঝানো যাবে। সেক্ষেত্রে ছবিতে রং দেবার সময়ও কাছের জিনিসের রং অপেক্ষা দূরের জিনিসের রং হবে হালকা।

ছবি যতই সুন্দর হোক না কেন অনুপাত ও দূরত্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ করা না গেলে কোনো অবস্থাতেই ছবি বাস্তবধর্মী হবে না। অনুপাতের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটি জিনিস অপর একটি জিনিস হতে কত বড় বা ছোট তা নিরূপণ করা। অতএব, বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মূল্যবান।

নতুন শিখলাম : অনুপাত, বাস্তবধর্মী ছবি।

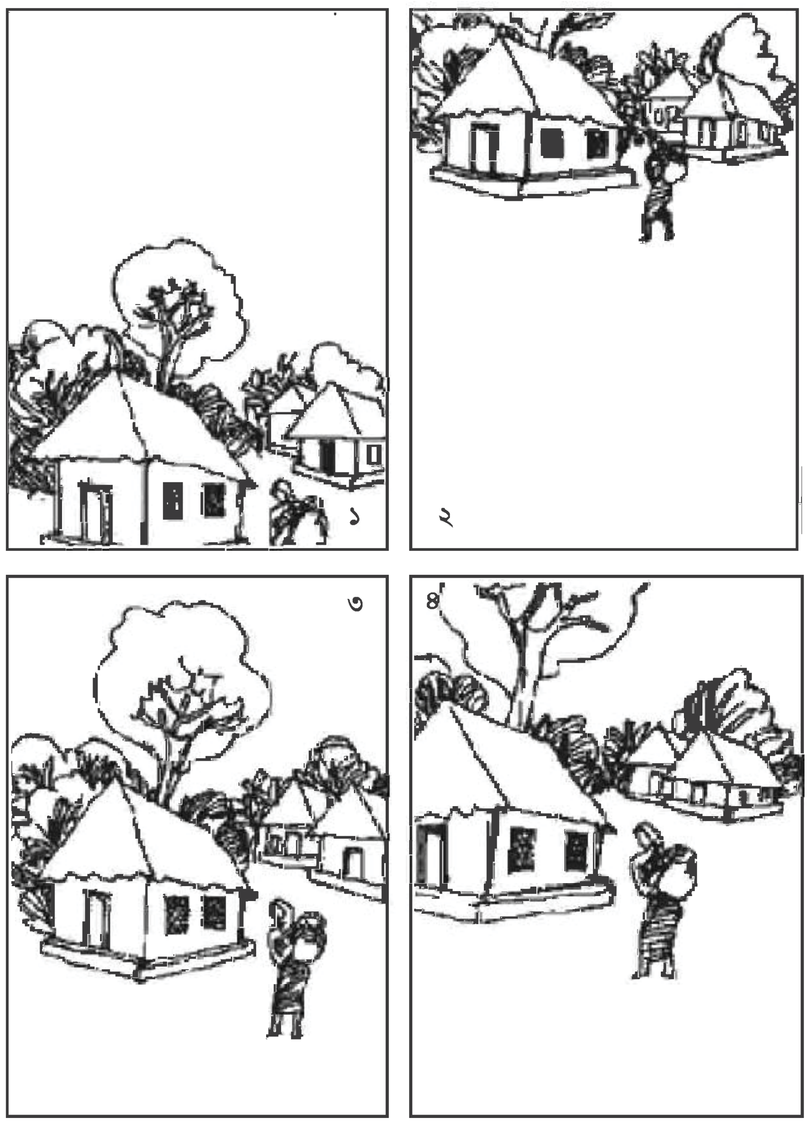

বিষয় সাজানো : ওপরে একই বিষয়ে চার রকমভাবে সাজানো হয়েছে। যেটি ভালো সেটি আঁকতে হবে। তবে ৩নং ছবি সবচেয়ে ভালো। তারপর ৪নং ১নং ও ২নং।

পাঠ: ৩

আলোছায়া

ছবি সাধারণত দুরকমভাবে হতে পারে। শুধু রেখাচিত্র বা ড্রইংভিত্তিক ছবি। আলপনা বা নকশা ও রেখাচিত্রের মধ্যেই পড়ে। এছাড়া অন্য যেভাবে ছবি আঁকা হয়, তাতে আলোছায়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবিতে আলোছায়া ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে হয়। সূর্যের কারণে যেমন আমরা দিন-রাত্রি পাই, তেমনি একই কারণে আলোছায়ার ব্যাপার ঘটে। আলোছায়ার কারণেই বিভিন্ন বস্তুর গঠনগত পার্থক্য অর্থাৎ গোল, চৌক বা অন্য যেকোনো আকৃতি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। সূর্যের আলো যেদিকে থাকে তার উল্টো দিকে ছায়া বা অন্ধকার থাকা স্বাভাবিক। প্রকৃতিতে এই রূপের আবার পরিবর্তন ঘটে। যেমন : সকালে এরকম আলোছায়া, দুপুরে আরও বেশি আলোছায়া, বিকেলে নরম রোদ এবং ছায়াও নরম হয়।

কোনো বস্তুতে, প্রকৃতি, মানুষ বা প্রাণীর উপর যেদিক থেকে আলো পড়ে সে দিকের রং হয় উজ্জ্বল। বিপরীত দিকের রঙের সাথে ছায়া মিশে থাকে। আলো ও ছায়ার প্রতিফলন ভালো করে দেখলে বুঝা যায় একই গাছের পাতায় সবুজ রং রোদে যেমন উজ্জ্বল সবুজ, তেমনি সেই গাছের পাতা ছায়াতে গিয়ে অন্যরকম সবুজ হলেও সবুজের উজ্জ্বলতা হারাবে না। প্রতিটি বিষয়ের যেমন নিজস্ব রং আছে আর তাতে আলোছায়ার প্রয়োগও ঐ রঙের সাথে সমন্বয় করে করতে হবে। একই দৃশ্যে সামনের বিষয়ের রং পিছনের বিষয় থেকে উজ্জ্বল হবে। যত দূরের বিষয় ততই রং ফিকে হবে। এভাবে আলোছায়ার মাধ্যমে ছবির বিষয়বস্তুতে নিকটত্ব, দূরত্ব, পরিপ্রেক্ষিত, ওপর-নিচ ইত্যাদি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়। নতুবা ছবি প্রাণবন্ত হয় না।

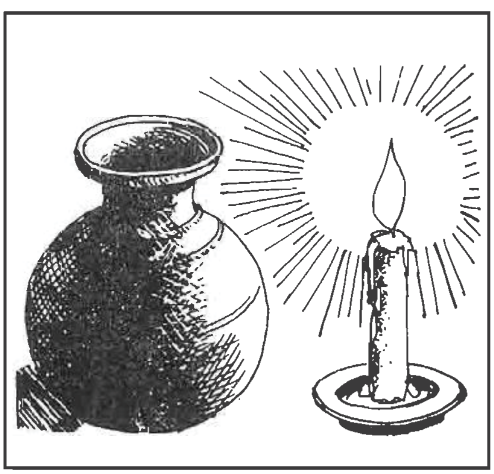

মোমবাতির আলো পড়েছে কলসিতে

রোদ, আলো, ছায়া ও অন্ধকার ছবিতে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে হয়

রঙের ব্যবহার

কেবল বই পড়ে রঙের ব্যবহার ভালোভাবে শেখা যাবে এমন বলা যায় না। শুধু রং কেন, এর আগে যতগুলো নিয়মের কথা জানলে তার কোনোটিই কিন্তু শুধু পড়ে শেখা যাবেনা। ছবি আঁকা হাতেকলমে শেখার বিষয়। তাই তত্ত্বগত জ্ঞানকে হাতেকলমে প্রয়োগ করে শিখতে হবে। বারবার এঁকে, নানা রকম রং লাগিয়ে বিভিন্ন রকম রঙের ব্যবহার রপ্ত করতে হয়। ছবি আঁকার বিভিন্নরকম রং আছে, তাদের ব্যবহারেরও নানারকম কৌশল আছে। ছবি আঁকার মাধ্যম নিয়ে আলোচনায় সে সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে। বিভিন্ন শেডের মধ্যে তিনটি রংকে প্রাথমিক রং বা মৌলিক রং (Primary Colour) বলে।

এই তিনটি রং হচ্ছে- লাল, নীল ও হলুদ। এই তিনটি রং একটির সাথে অন্যটি মিশিয়ে আবার অনেক রঙের শেড তৈরি করা যায়। যেমন- হলুদ ও লাল মেশালে হয় কমলা রং। হলুদ ও নীল মেশালে পাওয়া যাবে সবুজ রং। লাল ও নীলে হয় বেগুনি। লাল ও নীলের অংশ তারতম্য করে মেশালে পাওয়া যাবে খয়েরি। এভাবে ঐ তিনটি মৌলিক রং দিয়ে অনেক রং তৈরি করা যায়। এগুলোকে মাধ্যমিক রং বা Secondary Colour বলে। তবে একদম সাদা ও একদম কালো রঙের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক রং এর মিশ্রণে তৈরি করা সম্ভব নয়।

নতুন শিখলাম : প্রাথমিক রং, মাধ্যমিক রং।

পাঠ : ৪

ছবি আঁকার প্রাথমিক উপরকণ

উপকরণ অর্থ যা দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা হয়। উপকরণ এক বা একাধিক হতে পারে। যেমন একজন কাঠমিস্ত্রি যখন চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি বানায়, তখন তার হাতুড়ি, বাটাল, করাত ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এগুলো তার উপকরণ। তেমনি ছবি আঁকতে গেলে আঁকিয়ের যে সমস্ত জিনিস প্রয়োজন, সেগুলোকে আমরা ছবি আঁকার উপকরণ বলব।

ছবি আঁকার বিভিন্ন রকম উপকরণ রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমের ছবিতে বিভিন্ন রকম উপকরণ ব্যবহার করা হয়। কাগজ, পেনসিল, কালি-কলম, তুলি, বোর্ড, কিপ, ইজেল, রং ইত্যাদি হলো ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ। এবার ছবি আঁকার উপকরণগুলো সম্পর্কে আমরা জানব।

কাগজ

ছবি আঁকার প্রধান একটি উপকরণ কাগজ। এই কাগজ মোটা, পাতলা, খসখসে, মসৃণ ও চকচকে জমিনের হয়ে থাকে। বেশি মোটা কাগজকে আমরা বোর্ড বলি। এই বোর্ডও খসখসে, মসৃণ হয় এবং বিভিন্ন রঙের ও মানের পাওয়া যায়। ছবি আঁকার জন্য সাধারণ মানের যে কাগজ বাংলাদেশে পাওয়া যায় বা যে কাগজটি বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকার জন্য সহজলভ্য তার নাম কার্ট্রিজ কাগজ। কার্ট্রিজ মোটা পাতলা ২-৩টি মাত্রায় পাওয়া যায়। কার্ট্রিজ কাগজের রং ধবধবে সাদা নয়। একটু ঘোলাটে সাদা। এই কার্ট্রিজ কাগজে পেনসিল, কালি-কলম, জলরং ও প্যাস্টেল ছবি আঁকা যায়। আমাদের দেশে ছবি আঁকা শেখার জন্য প্রাথমিকভাবে এই কাগজটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধবধবে সাদা খানিকটা মোটা অফসেট কাগজে কালি-কলমে ও পেনসিলে সুন্দরভাবে ছবি আঁকা যায়। এই কাগজে জলরঙে ছবি

ছবি আঁকার কিছু উপকরণ

ভালো হয় না। জলরঙে ছবি আঁকার সবচেয়ে উপযুক্ত কাগজ হলো একটু মোটা ও খসখসে জমিনের। কার্ট্রিজ কাগজের খসখসে পৃষ্ঠায় সাধারণ মানের জলরং ছবি আঁকা যায়। তবে জলরং মাধ্যমের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাগজ হ্যান্ডমেইড কাগজ বা হাতে তৈরি কাগজ। এখন মেশিনেও এ কাগজ তৈরি হয়। তবে নাম রয়ে গেছে হ্যান্ডমেইড পেপার। এ কাগজে প্যাস্টেল রঙেও ছবি আঁকা যায়। আমাদের দেশে অন্যান্য যেসব কাগজ রয়েছে তা হলো আর্টকার্ড, আর্টপেপার, বক্সবোর্ড, পিচবোর্ড, নানান রঙের পাতলা মোটা কাগজ। সাধারণ লেখার এবং বই ছাপার কাগজ হলো নিউজপ্রিন্ট। আর্টকার্ড ও আর্টপেপার একমাত্র কালি-কলম ও তুলিতে ছবি আঁকার উপযোগী। এই কাগজ চকচকে ও মসৃণ। উন্নতমানের ছাপার জন্য এই কাগজ উপযোগী।

বক্সবোর্ড মোটা এবং একপিঠ সাদা রঙের ও মসৃণ হয়। আরেক পিঠ হয় হালকা ছাই রং বা বাদামি রঙের এবং সামান্য খসখসে। এ কাগজ সাধারণত ছবির মাউন্ট করা অর্থাৎ ছবির চারদিকে মার্জিন দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধাইয়ের কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কাগজের ছাই রং পিঠে প্যাস্টেলে ছবি আঁকা বেশ মজার। পিচবোর্ড খানিকটা মোটা ও শক্ত কাগজ। রং গাঢ় বাদামি এবং খাকি রঙেরও হয়ে থাকে। এতে প্যাস্টেল ঘষে ছবি আঁকা সম্ভব। বই বাঁধাই ও বিভিন্ন প্যাকেজিংয়ের জন্য বাক্স তৈরিতে যে খসখসে বোর্ড পাওয়া যায়, অনেক শিল্পীই বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকার জন্য এই বোর্ড ব্যবহার করে থাকেন।

রঙিন কাগজ রয়েছে নানা রঙের, মোটা, পাতলা, খসখসে ও মসৃণ। এই রঙিন কাগজে নানাভাবে ছবি আঁকা যায়। অনেক শিল্পী রঙিন কাগজ কেটে-ছিঁড়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে অনেক রকম ছবি তৈরি করেন। কাগজ কেটে, ছিঁড়ে যেসব ছবি তৈরি করা হয় তাকে বলে কোলাজ ছবি।

পেনসিল

ছবি আঁকার প্রধান একটি হাতিয়ার হলো পেনসিল। আমাদের সাধারণ লেখালেখির কাজে ব্যবহার করার জন্য আছে সাধারণ কিছু পেনসিল এবং ড্রইং করার জন্য বা ছবি আঁকার জন্য রয়েছে আলাদা কিছু পেনসি। এসব পেনসিলের গায়ে লেখা থাকে HB. B. 1B. 2B. 3B. 4B. 5B. I 6B. ইত্যাদি। শক্ত শীষের পেনসিল সাধারণত লেখার কাজে ব্যবহার হয়। এসব পেনসিলে কাগজে গাঢ়ভাবে দাগ কাটে না। ধীরে ধীরে নরম ও গাঢ় কালো হতে হলে 2B. 3B. 4B. 5B. এবং 6B -তে যেয়ে পেনসিলের শীষ বেশ নরম হয় ও কাগজে কালো হয়ে দাগ কাটে। অনেক শিল্পীই পেনসিল দিয়ে সম্পূর্ণ ছবি আঁকেন। 2B. 4B. I 6B. এই তিন মাত্রার পেনসিল দিয়ে অথবা যেকোনোটি দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা সম্ভব।

নতুন শিখলাম : কোলাজ ছবি, বক্সবোর্ড, কার্ট্রিজ কাগজ, হ্যান্ডমেইড কাগজ।

পাঠ: ৫

কালি কলম ও কালি তুলি

কলম দিয়ে আমরা লেখি। কলম দিয়ে ছবিও আঁকা যায়। ঝরণা কলমে কালো কালি ভরে তা দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যায়। অন্য রঙের কালি দিয়েও ছবি আঁকা যায়। তবে শিল্পীরা কালো কালিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ছবি আঁকার জন্য বিশেষ এক ধরনের কালো কালি রয়েছে, যাকে সাধারণত বলে চাইনিজ ইনক। অতি প্রাচীনকাল থেকে চীন দেশের শিল্পীরা ছবি আঁকায় কালো কালি প্রচুর ব্যবহার করতেন। তবে এই রকম কালো কালিকে ইন্ডিয়ান ইন্‌কও বলা হয়।

তুলিতে কালি লাগিয়ে অনেকেই ছবি আঁকেন। কালি দিয়ে আকা ছবি, কলম ও তুলির কারণে একটি আরেকটি থেকে ভিন্নতর হয়। ফেল্ট পেন বা সিগনেচার পেন নামে কিছু কলম দিয়ে সাদাকালো ও রঙিন ছবি আঁকা যায়। প্রায় একই বস্তু দিয়ে তৈরি মার্কিং পেন নামে যে কলম আছে তা দিয়েও ছবি আঁকা সম্ভব। বাঁশের সরু কঞ্চি ও খাগের কঞ্চি দিয়ে সরু ও মোটা কলম বানিয়ে কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তা দিয়ে ছবি আঁকা যায়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন খাগের কলম দিয়ে ছবি আঁকাতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর বহু বিখ্যাত ড্রইং এই ভাবে আঁকা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা অনায়াসে বাঁশের কঞ্চি ও খাগ যোগাড় করতে পারে।

তুলি

ছবি আঁকার জন্য তুলি হলো অন্যতম একটি হাতিয়ার। বিভিন্ন ধরনের রং, কাগজ ও ক্যানভাসের কারণে নানারকম তুলি তৈরি হয়ে থাকে। জলরং ও তেলরঙের জন্য আলাদা তুলি তৈরি হয়। কালি ও জলরঙের জন্য সাধারণত নরম ও কম শক্ত পশমের তুলি ব্যবহার হয়। তেলরং বা অস্বচ্ছ রঙের জন্য অপেক্ষাকৃত শক্ত পশমের তুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে তুলির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিল্পীর সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ও ইচ্ছার ওপর। তুলি সাধারণত পশুর পশম ও

কৃত্রিমভাবে পশম তৈরি করে বানানো হয়। ছবি আঁকার সুবিধার জন্য তুলি সরু থেকে ধীরে ধীরে মোটার দিকে, ০ (শূন্য) নং থেকে ২০নং পর্যন্ত করা হয়ে থাকে। ১নং হলো বেশ সরু, তারপর ২নং ও ৩নং করে ২০টি পর্যায়ে তৈরি করা হয়। আবার খুবই সরু ও পাতলা তুলির জন্য ১নং এর নিচের ০ (শূন্য) ০০ (দ্বিগুণ শূন্য) ইত্যাদি ভাবেও তুলি তৈরি হয়ে থাকে।

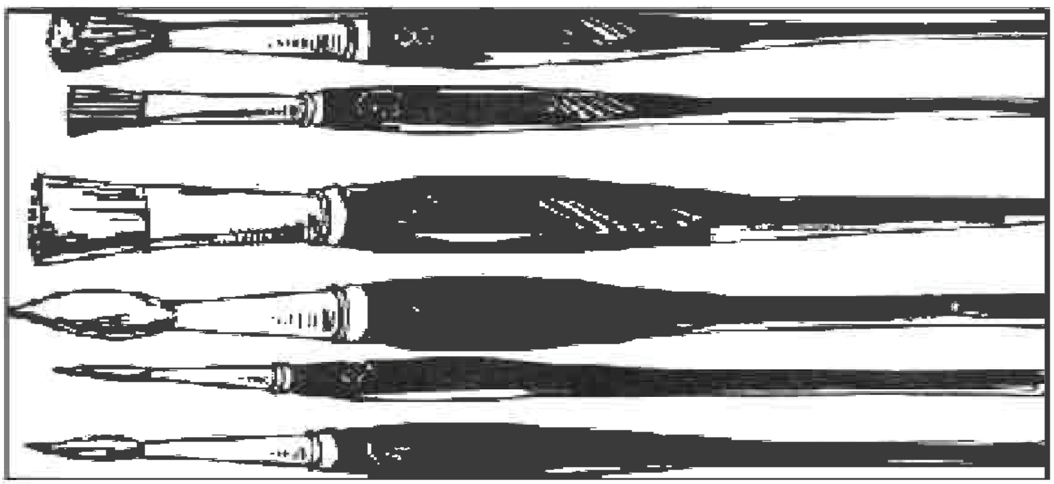

ছবি আঁকার তুলি

ক্যানভাস, বোর্ড, ক্লিপ ও ইজেল

বোর্ড, ক্লিপ ছবি আঁকার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। বোর্ডে কাগজ রেখে ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ছবি আঁকা সুবিধা। আর এই বোর্ডকে কেউ মেঝেতে বসে হাত রেখে, কেউ টেবিলে বসে আবার অনেকে ইজেলে রেখে ছবি আঁকে। তবে ইজেল ক্যানভাসে ছবি আঁকার জন্য সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয়। কে কীভাবে আঁকবে তা নির্ভর করে শিল্পীর সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর।

নতুন শিখলাম : চাইনিজ ইন্‌ক, ইন্ডিয়ান ইন্‌ক, ইজেল।

জলরং, তেলরং, প্যাস্টেল রং ও পেনসিল রং

পাঠ : ৬

ছবি আঁকার রং

রং ছাড়া ছবি আঁকার কথা চিন্তা করা যায় না, পেনসিল ও কালিতে ছবি আঁকলেও তা একটা রং হিসেবেই মনে করা হয়। তবে রঙিন ছবি বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন রকম রং দিয়ে আঁকা ছবি। ছবি আঁকার রং নানা রকম এবং বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। জলরং এ ছবি আঁকার জন্য এই রঙ বাক্সে, টিউব আকারে, ছোট ছোট কেকও পাউডার হিসেবে এবং পোস্টার রং কাচের কৌটায় পাওয়া যায়। পোস্টার রং জলরং থেকে একটু ভিন্ন মাধ্যম হলেও পোস্টার রং দিয়ে জলরঙের মতো ছবি আঁকা যায়। পাউডার রং পানিতে মিশিয়ে সহজেই ছবি আঁকা যায়। তবে সঙ্গে গাম বা আঠা মিশিয়ে নিয়ে হয়। অনেক শিল্পী অ্যারাবিক গাম বা আইকা গাম মিশিয়ে নেয়। প্যাস্টেল রং তিন রকম গুণের পাওয়া যায়। আরও আছে তেলরং। এটি তারপিন ও তিসির তেল মিশিয়ে আঁকতে হয়।

ছবির বিষয়

ছবির বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখবে আমাদের প্রকৃতিতে, জীবন যাপনে ও পরিবেশে ছড়িয়ে আছে অনেক ও অসংখ্য বিষয়। যে গ্রামে বাস করে, তার পক্ষে গ্রামের ছবি, যথা-ঘর-বাড়ি, গছ-পালা, পশু-পাখি, মাঠ-ঘাট, নদী-নৌকা, গ্রামের জীবনযাপন, মানুষজন, উৎসব, অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়েই ছবি আঁকা সম্ভব। আবার যে শহরে বাস করে, সে শহরের জীবনযাপন, শহরের রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, পার্ক, খেলাধুলা, শহরের অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি নিয়ে অনেক বিষয়ে ছবি আঁকতে পারবে। শহরে চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়াখানায় কত রকম জীব-জন্তু, পাখি থাকে। পশু-পাখির মজার মজার সব কান্ডকারখানা, শুয়ে থাকা, বসে থাকা, খেলাধুলার নানারকম অঙ্গভঙ্গি-এমনি অনেক কিছু হতে পারে ছবি আঁকার বিষয়।

গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, কুকুর-বেড়াল পোষা হয়। বনের পাখিও শখ করে অনেকেই পোষে। শহরের বাড়িতেও পোষা অনেক জীব-জন্তু আছে। পোষা পশুপাখিকেও ছবি আঁকার বিষয় হিসেবে সহজেই গ্রহণ করা যায়। নামকরা শিল্পীদের অনেক বিখ্যাত ছবি আছে পশু-পাখিকে বিষয় করে আঁকা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কাক ও গরুকে বিষয় করে এবং কামরুল হাসান গরু, হাতি, ঘোড়া, শেয়াল, সাপ ও নানারকম পাখিকে বিষয় করে অনেক ছবি এঁকেছেন। প্রিয় যেকোনো মানুষ, মা-বাবা, নানা-নানি, দাদা-দাদি, ভাই-বোন এমনি অনেকের ছবি আঁকা যেতে পারে। তাছাড়া ইচ্ছে করলে নিজের প্রতিকৃতিও আঁকা যায়। পৃথিবীর প্রায় সব শিল্পীরাই কোনো না কোনো সময় নিজেকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন, এখনও আঁকেন।

যে বিষয় নিয়ে ছবি আঁকা হবে, সে বিষয় সম্পর্কে আঁকিয়ের ভালো ধারণা থাকতে হবে। গ্রামে যে কখনও যায় নি, নৌকা দেখে নি, নদী দেখে নি, সে কীভাবে গ্রামের ছবি আঁকবে! সুতরাং গ্রামের ছবি আঁকতে হলে ভালোভাবে গ্রামের ঘর-বাড়ি, নৌকা-মাঝি, নদী, গাছ-পালা ইত্যাদি দেখতে হবে। শুধু বাইরের রূপটা দেখলেই চলবে না। ভেতরেও যে রূপ আছে তা তুলে ধরতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে। গ্রামের জীবনযাপন, মানুষজন এবং তাঁদের সহজ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবতে হবে। শহর ও বন্দরের ছবি আঁকতে হলেও সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে নিজের কল্পনা ও চিন্তাকে প্রকাশ করে ছবিকে সবদিক থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়।

পাঠ: ৭

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। তেলরং, জলরং, পোস্টার রং, এ্যাক্রেলিক রং, এনামেল রং, পেনসিল, কালি, প্যাস্টেল, রঙিন অক্সাইড, প্লাস্টিক রংসহ বহু রকম মাধ্যমে ছবি আঁকা হয়। শিল্পী তার সুবিধা ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো মাধ্যমেই একটি ভালো ছবি আঁকতে পারেন। জলরং, পোস্টার রং হলো পানি দিয়ে মিশিয়ে আঁকার রং। এ্যাক্রেলিক রঙেও পানি মিশিয়ে আঁকা যায়। এগুলোকে water baised রং বলে। সে অর্থে রঙিন অক্সাইড বা প্লাস্টিক রংও ওয়াটার বেইস্‌ড রং। তবে অক্সাইডের সাথে পানি ও গাম মিশিয়ে আঁকতে হয়। এগুলো অস্বচ্ছ রং। জলরং হচ্ছে স্বচ্ছ রং। স্বচ্ছ মানে কাগজে একটি রংঙের উপর আরেকটি রং প্রয়োগ করলে নিচের রংটিও দৃশ্যমান থাকে। দুটি রঙেরই আবেদন পাওয়া যায়। অন্যদিকে পোস্টার বা এ্যাক্রেলিক রং অস্বচ্ছভাবে ভারী করে প্রয়োগ করা চলে। আবার পাতলা করে গুলিয়ে স্বচ্ছ রং হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তবে জলরং, পোস্টার রং এগুলো সাধারণত কাগজেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ্যাক্রেলিক ও অক্সাইড রং কাগজ, ক্যানভাস বা হার্ডবোর্ডেও ব্যবহার করা যায়।

তেলরং, এনামেল রং এগুলো তেল দিয়ে মেশাতে হয়। এগুলোও অস্বচ্ছ রং অর্থাৎ একটি রংঙের উপর আরেকটি রং প্রয়োগ করলে নিচের রংটি ঢেকে যায়। এছাড়া কালিকলম ও কালি-তুলিতেও ছবি আঁকা যায়। এগুলো দিয়ে সাদা-কালো ছবি হয়। রঙিন কালিও পাওয়া যায়। তা দিয়ে জলরঙের মতো ছবি আঁকা যায়। আরো কিছু মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি আঁকা যায়। যেমন- কাঠকয়লা, ক্রেয়ন ও কালো রঙের মার্কিং কলম। বাড়ির সাধারণ কাঠকয়লা দিয়েও আঁকা যেতে পারে। কিন্তু তা খুব একটা সুবিধার নয়। ছবি আঁকার জন্য একরকম নরম ও সরু কাঠি দিয়ে কয়লা তৈরি করা হয়। তবে প্রাথমিকভাবে পেনসিল ও প্যাস্টেল ব্যবহার করে ছবি আঁকা সুবিধাজনক।

পাঠ: ৮

পেনসিল রং ও প্যাস্টেল রং

পেনসিল রং

এর আগে আমরা পেনসিল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। সাধারণ কাঠ পেনসিল থেকে শুরু করে সাদাকালো ছবি আঁকার জন্য 1B, B, 2B, 3B, 4B, 6B ইত্যাদি নম্বরের ছবি আঁকার পেনসিল পাওয়া যায়। 1B থেকে 6B পর্যন্ত পেনসিল ধীরে ধীরে নরম ও গাঢ় কালো হয়ে থাকে। এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আলোছায়া প্রয়োগ করে যেকোনো বিষয়ে একটি সাদা-কালো ছবি আঁকা সম্ভব। যেখানে আলো বেশি, সেখানে হালকা অর্থাৎ B, 1B-এরপর আর একটু কম আলোতে 2B বা 3B এবং ছায়া যেখানে বেশি, সেখানে 4B এবং 6B নম্বরের পেনসিল ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগে সাদাকালো ছবি পেনসিল দিয়ে আঁকা সম্ভব। কাগজে পেনসিল চালনা করে শেড বা ছায়া দেবার জন্য বিভিন্ন কৌশল আছে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তা হাতেকলমে শিখে নিতে হবে। পেনসিল দিয়ে এভাবে সাদা-কালোতে মানুষের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে শুরু করে যেকোনো বস্তু বা বিষয়ের ছবি নিখুঁতভাবে আঁকা সম্ভব। একই ভাবে রঙিন পেনসিল ব্যবহার করেও রঙিন ছবি আঁকা যায়। বাজারে বিভিন্ন রঙিন পেনসিল অনেক রঙে পাওয়া যায়। ১২ থেকে ৪৮ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্যাকেট করা হয়। কিছু কিছু রঙিন পেনসিল পানিতে ভিজিয়ে কাগজে ঘষলে জলরঙের এর মতো আবহ তৈরি হয়। তবে পেনসিলে ছবি আঁকার জন্য একটু মোটা ও খসখসে জমিনের কাগজ প্রয়োজন।

প্যাস্টেল রং

প্যাস্টেল রংকে বলা যায় রঙের কাঠি। এটিকে দুরকমভাবে পাওয়া যায়। মোম প্যাস্টেল ও চক প্যাস্টেল। রঙের কাঠি ঘষে ঘষে কাগজে লাগাতে হয়। কাগজটি হতে হবে একটু মোটা ও খসখসে জমিনের। প্যাস্টেল রঙের সুবিধা হলো এতে পানি, তেল বা আঠা মেশানোর প্রয়োজন হয় না। পেনসিল রং অপেক্ষা উজ্জ্বল হয় এর রং। তবে চক প্যাস্টেল যেহেতু খুব নরম ও আঁকার পরে রঙের পাউডার ছবি নাড়াচাড়ার কারণে ঝরে যেতে পারে বা মুছে যেতে পারে, তাই তরল ফিক্সাটিভ স্প্রে করে রংকে স্থায়ী করে নিতে হয়। এই তরল ফিক্সাটিভ শিশির মধ্যে রঙের দোকানে পাওয়া যায়। মোম প্যাস্টেল বা অয়েল প্যাস্টেলের প্যাকেটের গায়ে ইংরেজিতে ‘অয়েল প্যাস্টেল’ লেখা থাকে। মোম বা অয়েল প্যাস্টেল ব্যবহার করে ছবি আঁকা অনেক বেশি সুবিধা। এটা ব্যবহার করে সম্পূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা সম্ভব। এটা স্থায়ী করার জন্য কোনো স্প্রে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। একটি রঙের সাথে অন্য রং মেশানো সহজ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লাল, নীল ও হলুদ এই তিনটি রং কে-

ক. মাধ্যমিক রং বলে   খ. প্রাথমিক রং বলে

গ. মিশ্র রং বলে   ঘ. অস্বচ্ছ রং বলে

২. কাছের জিনিস অপেক্ষা দূরের জিনিস কত ছোট হবে তার পরিমাপকে বলে-

ক. অনুকরণ খ. অনুপাত

গ. আলোছায়া ঘ. সীমারেখা

৩. হলুদ রং ও নীল রং মিলে হয়-

ক. বেগুনি রং খ. সবুজ রং

গ. গাঢ় হলুদ রং ঘ. কমলা রং

৪. বাংলাদেশে ছবি আঁকার জন্য সাধারণ মানের যে কাগজটি সহজলভ্য তার নাম-

ক. নিউজ পেপার খ. কার্ট্রিজ পেপার

গ. হ্যান্ডমেড পেপার ঘ. পোস্টার পেপার

৫. এ্যাক্রেলিক রঙে ছবি আঁকার জন্য-

ক. তেল মিশাতে হয় খ. গাম মেশাতে হয়

গ. পানি মিশাতে হয় ঘ. অক্সাইড মিশাতে হয়

৬. নিচের শব্দগুলো পাশাপাশি বসিয়ে মিল কর।

বাম	ডান
ক্যানভাস	গাম
তেলরং	পানি
অক্সাইড রং	ইজেল
পোস্টার রং	ক্লিপ
বোর্ড	তেল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পেনসিল ব্যবহার করে একটি গ্রামের দৃশ্য আঁকতে বললেন। তিনি তার আগে সঠিকভাবে কাগজ নির্বাচন করার পরামর্শ দিলেন।

৭. পেনসিলে ছবি আঁকার জন্য ছবিতে হালকা ছায়া দেখাতে শিক্ষার্থীরা কোন কোন নম্বরের পেনসিল ব্যবহার করবে?

ক. HB বা 6B খ. 2B বা 3B

গ. 4B বা 1B ঘ. 4B বা 6B

৮. শিক্ষার্থীরা নিচের কোন কাগজটি নির্বাচন করলে সঠিক হবে?

ক. কার্ট্রিজ পেপার খ. হ্যান্ডমেইড পেপার

গ. পিচবোর্ড ঘ. আর্ট পেপার

রচনামূলক প্রশ্ন

৮। ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে যা জান লেখ।

৯। ছবি আঁকার রং সম্পর্কে বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ছবি আঁকার অনুশীলন

এই অধ্যায় অনুশীলন শেষে আমরা

- প্রকৃতির সাধারণ বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণে আগ্রহী হব।
- গাছ, ফুল, লতা-পাতার ছবি আঁকতে পারব।
- দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস আঁকতে পারব।
- প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারব।
- জ্যামিতিক নকশা আঁকতে সমর্থ হব।

কয়েক প্রকার ফুলের অনুশীলনের চিত্র

পাঠ : ১

ছবি আঁকা মূলত ব্যবহারিক কাজ, ছবি আঁকার তত্ত্বগত ধারণা এর আগে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত জেনেছি। শুধু তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। নিজের সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে হাতেকলমে অনুশীলনের মাধ্যমে ছবি আঁকার দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

এ পাঠের মাধ্যমে আমরা ফুল আঁকার কিছু সাধারণ নিয়ম জানব।

উপরের অঙ্কিত ফুলের চিত্রগুলো আঁকতে গিয়ে আমরা দেখলাম, বৃত্তের বহুবিধ ব্যবহার, বিশেষ করে গোলাকার বস্তু আঁকতে গেলে বৃত্তের ব্যবহার একটু বেশি হয়। এই গোলাকার আকৃতিকে আবার নানাভাবে আমরা দেখি। যখন আমরা কোনো গোল বস্তুকে উপর অথবা নিচ থেকে দেখব তখন কিন্তু গোলই দেখব। আবার যখন চোখ বরাবর আড়াআড়ি করে দেখব তখন কিন্তু আবার চ্যাপ্টা দেখব। এ বিষয়ে আমরা এখন জানব।

কাজ : নিজ নিজ খাতায় বৃত্তের ব্যবহার করে তোমার প্রিয় দুটি ফুল আঁকবে।

পাঠ : ২

পাঠ ১-এ আমরা ফুল আঁকার কিছু সাধারণ নিয়ম জেনেছিলাম। কিন্তু ফুলতো আর একা নয়, তার সাথে রয়েছে কাণ্ড, বৃতি, পাতা, কলি, কাঁটা ইত্যাদি। তাই আঁকার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোন জিনিসটি কোন দিকে হেলে, দুলে আছে, তার আঁকার-আকৃতিই বা কেমন, আবার প্রতিটি ফুলের রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, রং। তেমনি পাতার গঠনেও রয়েছে আলাদা আলাদা রূপ। এ সকল পাতা আঁকার সময়ও একটু গভীরভাবে দেখে নেব। প্রতিদিন যেসব পাতা আমরা দেখি, সেখান থেকে কয়েক প্রকারের পাতা সংগ্রহ করে ড্রইং খাতার উপর রেখে তা অনুশীলন করতে পারি।

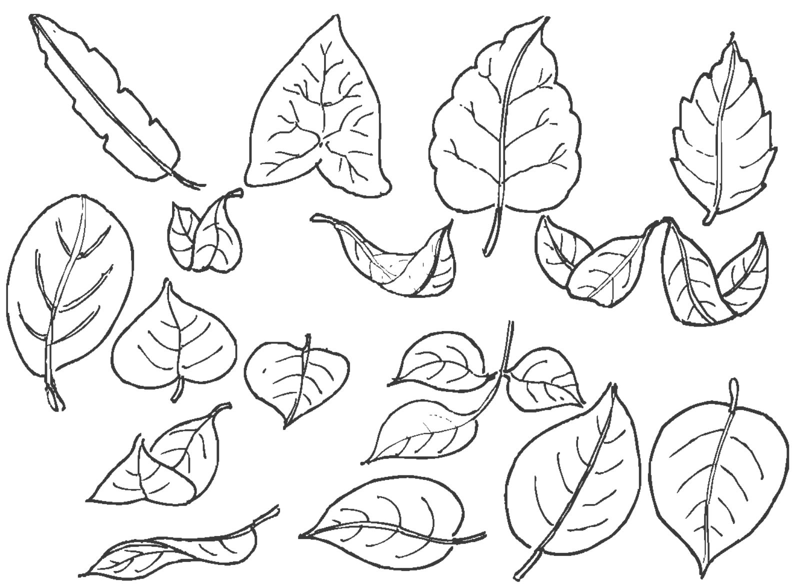

কয়েক প্রকার পাতার অনুশীলনের চিত্র

কাজ : তোমার খাতায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ৩-৪ টি পাতা অঙ্কন করে দেখাবে।

পাঠ : ৩

দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের অনুশীলন

যে সকল জিনিস আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে সকল জিনিসপত্র ছাড়া আমরা চলতে পারি না যেমন, থালা-বাসন, জগ, গ্লাস, হাঁড়ি-পাতিল, চেয়ার, টেবিল, বইপত্র ইত্যাদিকে আমরা দৈনন্দিনের ব্যবহার্য জিনিস বলতে পারি। এসব জিনিস আঁকতে গেলে আমাদের নানা প্রকার রেখা ব্যবহার করে এর আকার, আকৃতি, গঠন অবয়ব যতখানি সম্ভব নিঁখুত ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য রেখাকে আমরা ছবি আঁকার মূল প্রাণশক্তি বলতে পারি।

রেখা সাধারণত দুই প্রকার-

১। সরল রেখা

২। বাঁকা রেখা

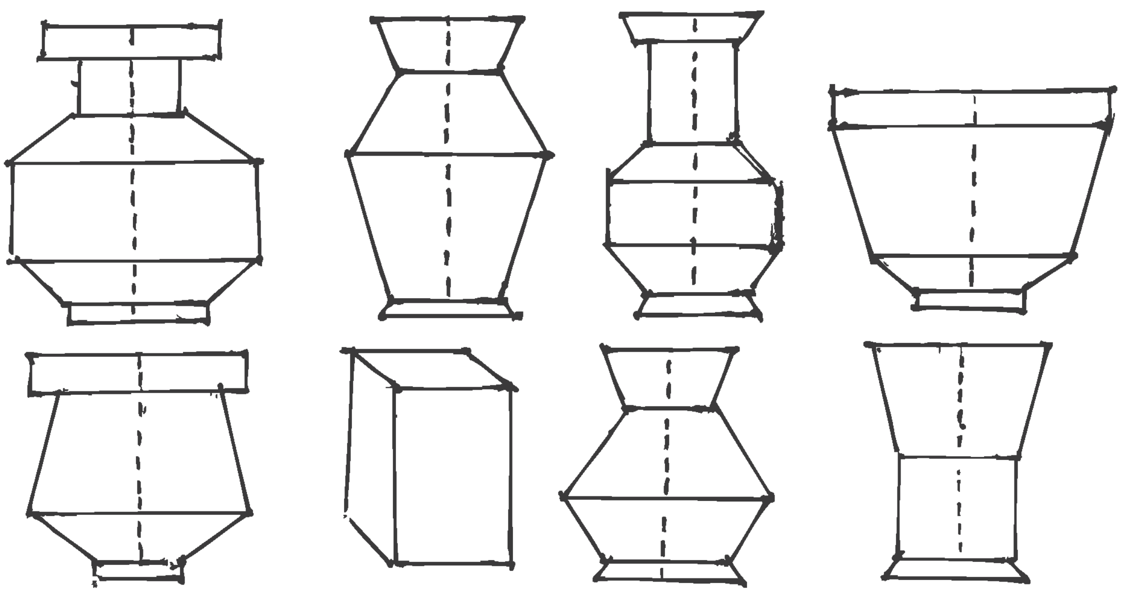

সরল রেখার সাহায্যে কতগুলো ব্যবহার্য জিনিসের প্রাথমিক আকার দেখব-

> **কাজ :** সবাই নিজ নিজ ড্রইং খাতায় যেকোনো তিনটি ব্যবহারিক জিনিসের সরল রেখা দিয়ে তার কাঠামো তৈরি করে দেখাবে।

পাঠ : ৪

পূর্ব পাঠে আমরা শুধু ব্যবহারিক জিনিসের সরল রেখা ব্যবহার করে তার কাঠামো তৈরি শিখেছিলাম এই পাঠে আমরা সেই সব কাঠামো থেকে জিনিসগুলোর আসল রূপ বাঁকা রেখার সমন্বয় করে আকার-আকৃতি ও গঠন নিখুঁতভাবে নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে ফুটিয়ে তুলব।

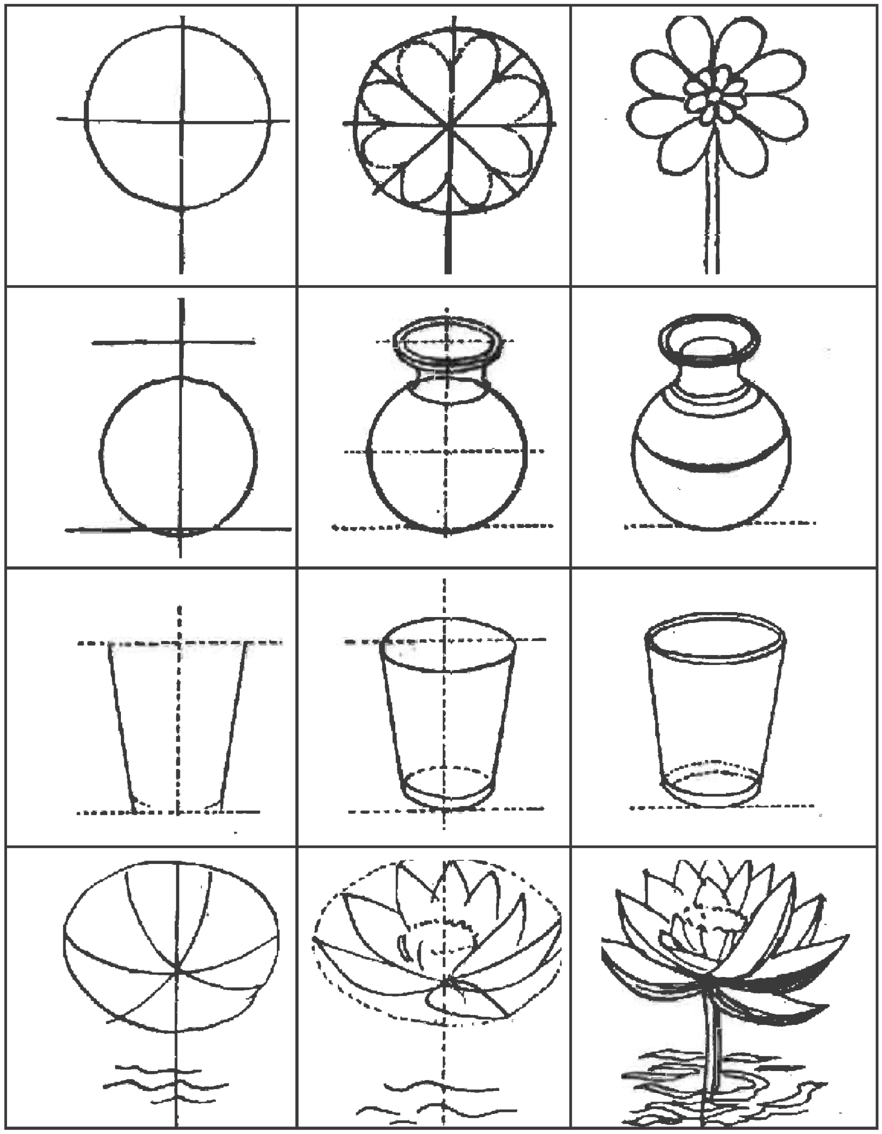

কাজ : প্রত্যেকে নিজ নিজ ড্রইং খাতায় তোমার ব্যবহার্য তিনটি জিনিসের সম্পূর্ণ ড্রইং এঁকে দেখাবে।

পাঠ : ৫ থেকে ১০

প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুশীলন

প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুশীলনের পূর্বে আমরা প্রাকৃতিক বিশেষ করে যে ধরনের দৃশ্য আমরা আঁকতে চাই, সে সম্পর্কে নিজের ধারণাকে স্পষ্ট করে নিতে হবে। যেমন বিশেষ কোনো ঋতুর ছবি আঁকতে হলে ঐ ঋতু সম্পর্কে প্রথমে ভালোভাবে জেনে তারপর ঐ বিষয়গুলোকে ছবিতে তুলে ধরতে হবে। নিচের ছবিগুলো দেখলে এ বিষয়ে তোমাদের ধারণা পেতে সহজ হবে।

গ্রীষ্মকাল

বর্ষাকাল

শরৎকাল

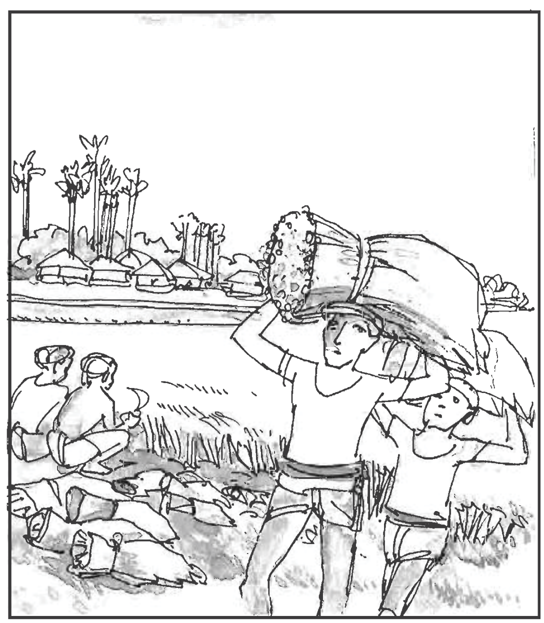

হেমন্তকাল

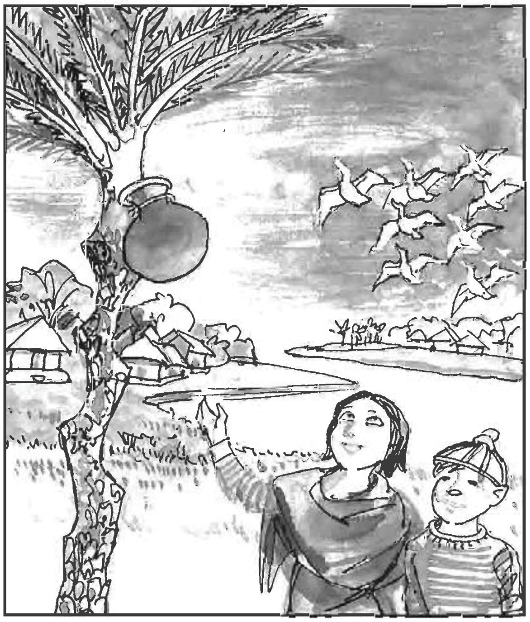

শীতকাল

বসন্তকাল

পাঠ : ১১, ১২ ও ১৩

বিষয়ভিত্তিক ছবির অনুশীলন

পূর্ব পাঠগুলোতে আমরা প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে নানা রকমের মজার মজার ছবি এঁকেছি। রং করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমন মাতৃভূমির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি।

এই পাঠে আমরা শিখব বিষয়ভিত্তিক ছবি। কোনো উৎসব, জাতীয় দিবসসমূহ, আমাদের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য দিনগুলোকে ভিত্তি করে যে সকল ছবি আঁকা যায়, তাকে আমরা বিষয়ভিত্তিক ছবি বলতে পারি।

নানারকম উৎসবে আমরা বন্ধুদের নিয়ে, ভাইবোনদের নিয়ে অনেক আনন্দ করি। ঈদের দিন ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়ে বন্ধুদের সাথে কোলাকুলি করা, ঘরে ঘরে সেমাই জরদা খাওয়ার আনন্দ। আবার দুর্গাপূজায় মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন, নুতন জামা পরে বাবা-মার সাথে পূজামণ্ডপে গিয়ে আরতি নৃত্য দেখা আরও কত কী।

আবার বড় দিনের উৎসবের আনন্দ সান্তাক্লজের কাছ থেকে চকলেট নেয়ার, নতুন জামা-কাপড় পরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, বৌদ্ধ পূর্ণিমায় প্যাগোডায় গিয়ে আনন্দ উৎসবের মাঝে নিজেদের মাঝে ভাববিনিময় করা, এই সকল বিষয়গুলো আমরা এতদিন উপভোগ করেছি। এখন যদি এ সকল বিষয়ের উপর তোমাকে ছবি আঁকতে বলা হয়, তখন তুমি তোমার কল্পনার মাঝে যে ছবিটি আছে, তাকে বুদ্ধি খাটিয়ে মনের মাধুরী দিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে। আবার শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও ছবি আঁকা যেতে পারে।

শিশুদের আঁকা বৈশাখী মেলা

কাজ : তোমার দেখা একটি উৎসবের ছবি এঁকে দেখাও।

পাঠ : ১৪ ও ১৫

নকশা

পূর্ব পাঠগুলোতে আমরা ছবি আঁকার নানান বিষয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা, আবার কোনো বিষয়কে ভিত্তি করে ছবি আঁকার বিষয়ে জেনেছি।

এবার আমরা নকশা সম্পর্কে জানব। আমরা যে সকল পোশাক পরি তার বেশির ভাগ পোশাকে কোনো না কোনো নকশা করা কাজ আছে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে যে সকল আসবাবপত্র, যে সকল জিনিসপত্র প্রতিদিন ব্যবহার করি, দেখবে তার গায়ে সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা। গ্রামে ও শহরের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতেও দেখবে অনেক চোখ জুড়ানো অলংকরণ। এ ছাড়াও গ্রাম কিংবা শহরের বৈশাখী মেলাসহ নানা প্রকার মেলায় যে সকল খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল পাওয়া যায় তাতেও আছে নকশার প্রাচুর্য। উৎসবের দিনগুলোতে তো আমরা বাড়ির অঙিনায় আলপনা আঁকি। এসবই নকশা। এগুলো যেমন ফুল, পাখি, লতা-পাতা আবার বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার যেমন- বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি ব্যবহার করেও নকশা আঁকা যায়।

নকশা তৈরির সহজ নিয়ম

(ছবি দিয়ে হাতে কলমে শেখা)

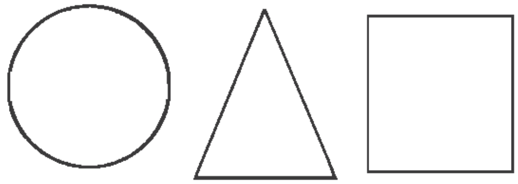

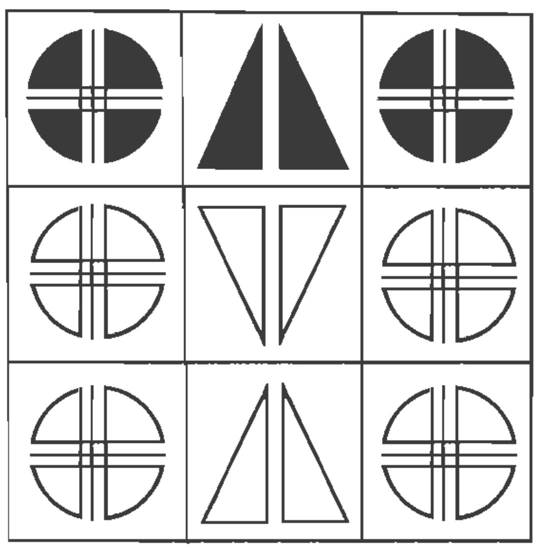

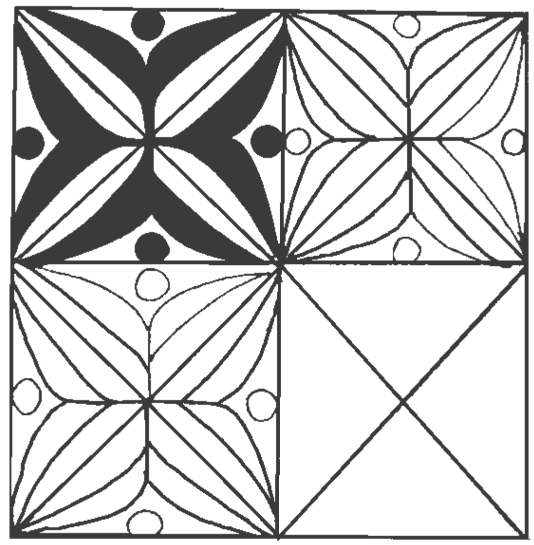

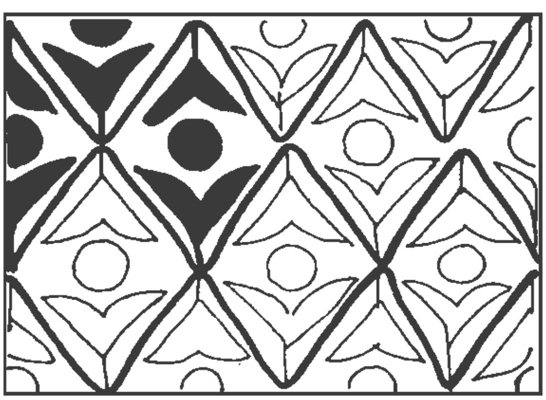

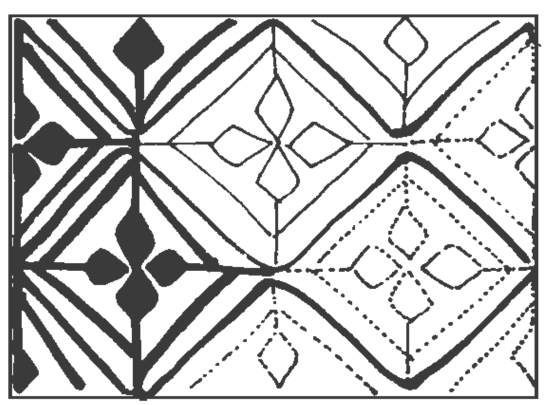

গোল, তিনকোনা ও চারকোনা এই তিনটি আকৃতি দিয়ে নানাভাবে সাজিয়ে ২টি নকশা করা হয়েছে। নকশা ২টি কালি ভরাট করে শেষ কর।

দুটি পাতা, একটি ফোটা, চারকোনা ঘর ও কিছু রেখা টেনে ২টি নকশা করা হয়েছে। বাকিটুকু শেষ কর। নিজের ড্রইং খাতায় এভাবে আরও নানারকম নকশা তৈরি কর।

কাজ : সকলের জন্য : লতা-পাতা-ফুল দিয়ে ৫"X৫" দিয়ে কাগজের মাপে তোমার মনের মতো একটা নকশা পেনসিল দিয়ে এঁকে দেখাও।

নমুনা প্রশ্ন

১. বৃত্ত ব্যবহার করে তোমার প্রিয় তিনটি ফুল ও পাতা এঁকে রং কর।

২. দৈনন্দিন ব্যবহার্য যেকোনো দুটি বস্তু এঁকে পেনসিলে আলো-ছায়া দেখাও।

৩. দৈনন্দিন ব্যবহার্য যেকোনো দুটি বস্তু এঁকে রং কর।

৪. গ্রীষ্মকালের একটি চিত্র তোমার মনের মতো এঁকে পোস্টার অথবা প্যাস্টেল রং দিয়ে আঁক।

৫. শীতকালের একটি চিত্র এঁকে রং কর।

৬. বর্ষাকালের একটি চিত্র এঁকে রং কর।

৭. শরৎকালের প্রকৃতি নিয়ে একটা সুন্দর চিত্র তোমার মনের মতো করে আঁক।

৮. হেমন্তকালের বাংলার প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য নিয়ে তোমার মনের মতো একটা ছবি এঁকে রং কর।

৯. ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্য নিয়ে তোমার মনের মতো একটা ছবি এঁকে রং কর।

১০. ধর্মীয় উৎসবের বর্ণনা দিয়ে মনের মতো একটা ছবি আঁক।

১১. তোমার দেখা কোনো মেলার বর্ণনা দিয়ে একটা সুন্দর ছবি আঁক।

১২. ফুল, লতা, পাতা দিয়ে ৮" X ৮" পরিমাপে একটা নকশা আঁক।

১৩. বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ দিয়ে ৮" X ১০" পরিমাপে একটা নকশা আঁক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

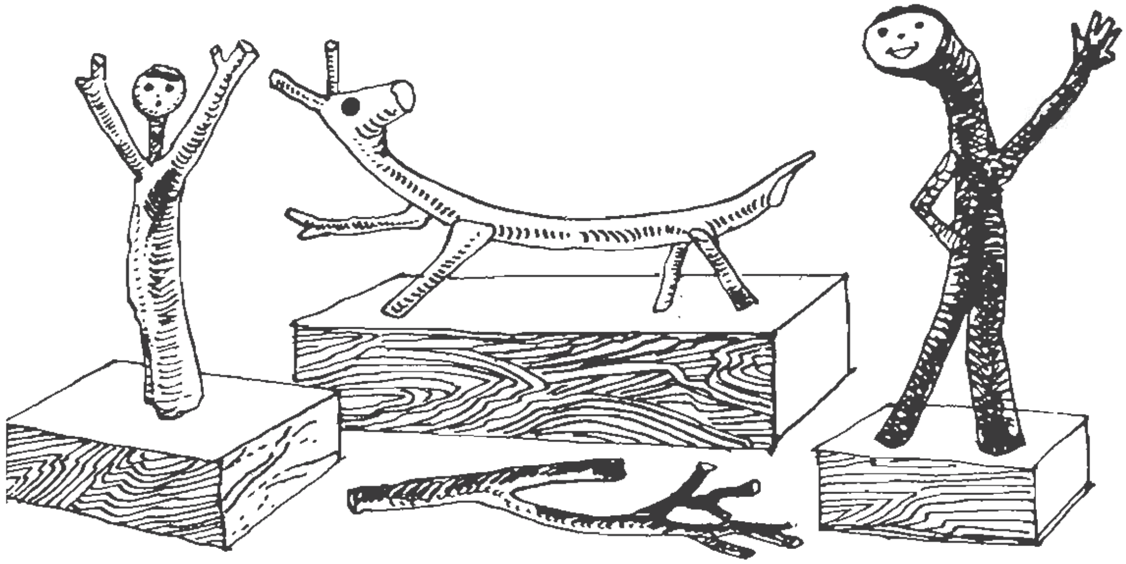

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বিভিন্ন প্রকার কাগজের নাম ও প্রকারভেদ জানতে পারব।
- নানারকম উৎসবে ঘর সাজাতে পারব।
- কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার নকশা তৈরি করতে পারব। কাগজ দিয়ে ঝালর তৈরি করতে পারব।
- বিভিন্ন ফেলনা জিনিস সংগ্রহ করার আগ্রহ বাড়বে।
- ফেলনা জিনিসগুলো দিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

কাগজ সভ্যতার নিদর্শন। বর্তমান বিশ্বে কাগজের খুব বেশি ব্যবহার হয়। লেখা লেখির জন্য কাগজ যেমন সরাসরি ব্যবহার করা হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও নানাবিধ কাজে কাগজ ব্যবহার করা হয়। আমরা কাগজ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্মও তৈরি করতে পারি। যেসব জিনিস সাধারণত কোনো কাজে লাগবে মনে হয় না, ফেলে দেওয়া হয়, আমরা চেষ্টা করলে তা দিয়েও সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি।

বর্তমান যুগে কাগজ আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কাগজ ছাড়া এক দিনও আমরা চলতে পারি না। বইখাতা, খবরের কাগজ, বিষয়-সম্পত্তির দলিলপত্র, চিঠিপত্র, ঘর সাজানো ও অনুষ্ঠানে সাজসজ্জার শিল্পকর্ম, পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ যেসব জিনিস বাজারে বেচাকেনা হয় তার লেবেল, মোড়ক, বাক্স, কার্টুন থেকে শুরু করে মুদি দোকানের ঠোঙা পর্যন্ত হাজারো প্রয়োজনে কাগজ ব্যবহার হয়। কাগজের ব্যবহার এত ব্যাপক যে তার হিসেব দেয়া মুশকিল। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাগজ। কত নামের, কত ধরনের শক্ত, নরম, মোটা, পাতলা, সাদা ও রঙিন কাগজ তৈরি হয় তারও হিসেব নেই। কিছু কিছু কাজ আছে যা আমরা প্রয়োজনের তাগিদে করে থাকি। আবার কিছু কিছু কাজ আছে আমরা মনের আনন্দে করি। প্রয়োজনেও লাগে। কাগজ কেটে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার্য জিনিস বা সাজসজ্জার জন্য যে সকল দ্রব্য তৈরি করে থাকি, এই কাজগুলোকে আমরা শিল্পকর্ম বলতে পারি।

তাহলে এবার আমরা কাগজ দিয়ে কী কী শিল্পকর্ম তৈরি করা যায় তা জানি এবং এসব তৈরি করতে কী কী উপকরণের প্রয়োজন তাও জানি।

পাঠ : ২

উপকরণ : কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম। এর প্রধান উপকরণ হলো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের কাগজ। তাছাড়া লাগবে মোটা সুতা, সুতলি, কাগজ কাটার ধারালো ছুরি, ছোট-বড় কাঁচি, ময়দার ঘন আঠা ইত্যাদি।

কাগজের শিল্পকর্মে প্রধান উপকরণ বিভিন্ন রঙের কাগজ- সাদা, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি ইত্যাদি। কাজের উপযোগী কাগজ জোগাড় করে নিই। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে মোটা সুতা, সুতলি, বাঁশের সরু কাঠি অথবা পাটকাঠি, কাগজ কাটার ধারালো ছুরি, ছোট-বড় কাঁচি, ময়দার ঘন আঠা ইত্যাদি।

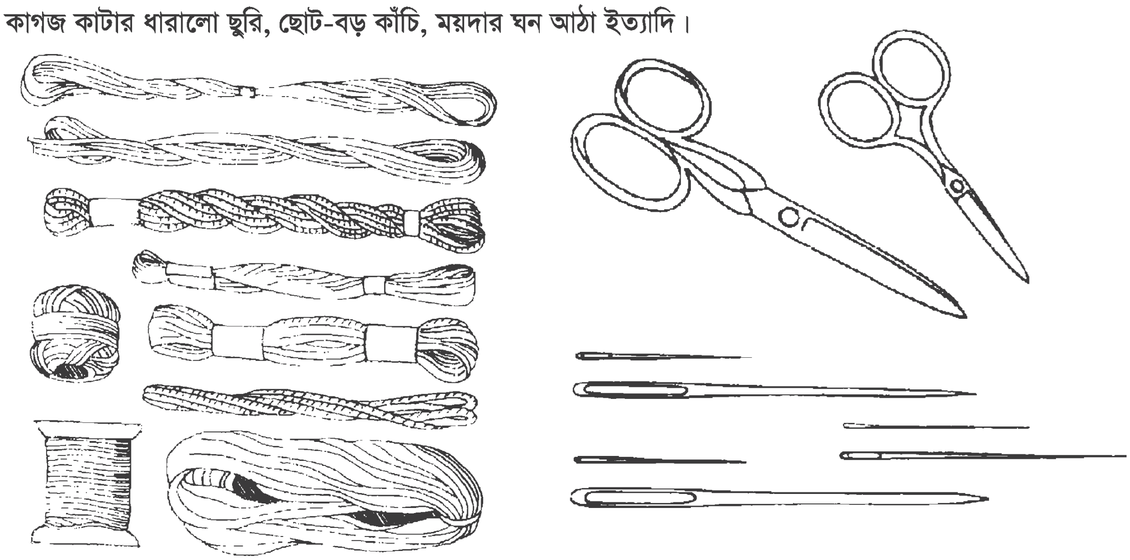

বিভিন্ন প্রকার উপকরণ

পাঠ: ৩ ও ৪

কাগজের ঝালর

সাজসজ্জার কাজে ঝালর লাইন করে ঝুলানো হয়। ঝালরে বাতাস লেগে যখন ঢেউ খেলে যায়, তখন খুবই সুন্দর লাগে। লম্বাটে চার কোণা ও তিন কোণা রঙিন কাগজ ঝুলিয়ে দিলেই সাধারণ ঝালর তৈরি হয়ে যায়। শিকল তৈরির কাগজ সমান লম্বা বা বিভিন্ন মাপের পরপর লাগিয়ে ঝালর তৈরি করা যায়। শুধু খেয়াল রাখব প্রত্যেক দুই খণ্ড কাগজের মাঝখানে ফাঁক যেন আগাগোড়া সমান থাকে। কোন রঙের পাশে কোন রং দেখতে ভালো ও সুন্দর হবে, সেটা ঠিক করে লাগাব। ছবি দেখে সহজেই এই ঝালর তৈরি করতে পারব। ঝালর তৈরি হলে সুতা বা সুতলির দুই মাথা টান করে দুদিকে কিছুর সাথে বেঁধে দিয়ে অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার কাজ করতে পারব।

রঙিন কাগজের ঝালর

২৫ সেমি. লম্বা ও ১৯.০৫ সেমি. চওড়া এক খণ্ড পাতলা রঙিন কাগজ নিই। ঘুড়ি তৈরির কাগজেই ভালো হবে। কাগজটিকে এমনভাবে আট ভাঁজ করি, যাতে ভাঁজ করা কাগজ লম্বা দিকে সাড়ে সাত ইঞ্চি ও চওড়া দিকে সোয়া এক ইঞ্চি হয়ে যায়।

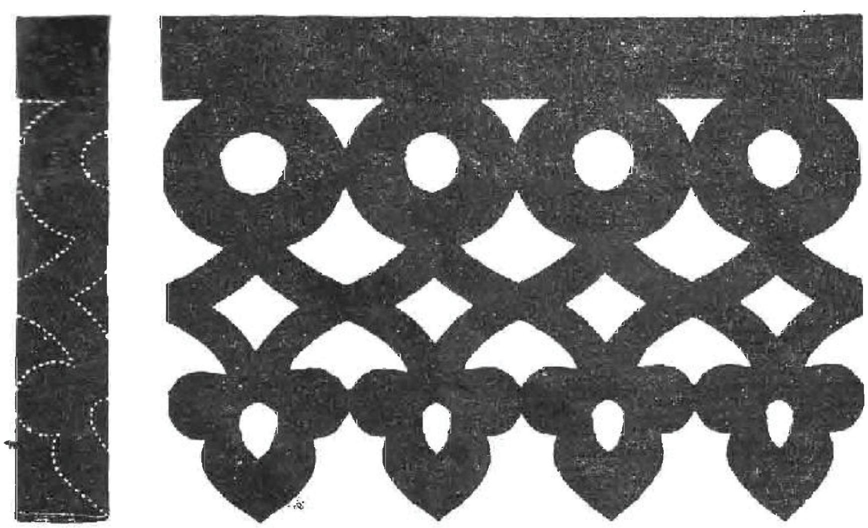

কাগজের নকশা কাটা ঝালর

ছবি দেখে ভাঁজ করা কাগজের ওপর নকশা আঁকি। এবার ধারালো কাঁচি দিয়ে নকশাটি কেটে নিই। আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলি। কী সুন্দর নকশা কাটা ঝালর তৈরি হয়ে গেল। এক টুকরো শক্ত কাগজের বোর্ডে নকশা কেটে একটি ফর্মা তৈরি করে নিলে কাগজ ভাঁজ করে এই ফর্মা বসিয়ে দাগ দিয়ে একই নকশার যত খুশি ঝালর তৈরি করতে পারব। এবার প্রয়োজন ও পছন্দের জায়গায় টান করে সুতলি টানাই। ঝালরের ওপরের কিনারায় আঠা লাগিয়ে সুতলি মুড়ে ঝালর লাগিয়ে যাই। সুতলি ছাড়াও ঘরের দেয়ালে, বেড়ার কাঠে কিংবা দরজার চৌকাঠে লাইন করে এই ঝালর লাগতে পারব।

পাঠ : ৫,৬ ও ৭

কাগজের নকশা কাটা ফুল

নকশা কাটা ঝালরের মতো, আমরা নকশা কাটা ফুলও তৈরি করতে পারি। ফুলের জন্য বর্গাকৃতি বা চারপাশ সমান চার কোণা কাগজ নিই। কাগজটি প্রথমে কোণাকুণি ভাঁজ করি। ছবি দেখে পর পর আরও তিনবার ভাঁজ করি। এবার ভাঁজ করা কাগজের ওপর ছবির মতো করে একটা সহজ নকশা এঁকে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলি। আস্তে আস্তে খুলে দেখি কী সুন্দর নকশা কাটা ফুল হয়ে গেল। এভাবে আমরা ছোট-বড় কোনো মাপের নকশা কাটা ফুল তৈরি করতে পারি। বড় কাগজ দিয়ে বড় ফুল, ছোট কাগজ দিয়ে ছোট ফুল। বড় ফুলে বেশি নকশা কাটতে হবে এবং ছোট ফুলে কম নকশা। ঘরের দেয়ালে, মঞ্চের পেছনে কাপড় অথবা শক্ত কাগজের ওপর এরকম নকশা কাটা ছোট-বড় ফুল বসিয়ে সাজাতে পারি। শুধু খেয়াল রাখব কোন রঙের ওপর কোন রঙের নকশা কাটা ফুল বসালে ভালো দেখা যায় ও বেশি সুন্দর লাগে। কাগজের বোর্ডে নকশার ফর্মা কেটে নিলে বারবার একই নকশার ফুল তৈরি করতে পারব।

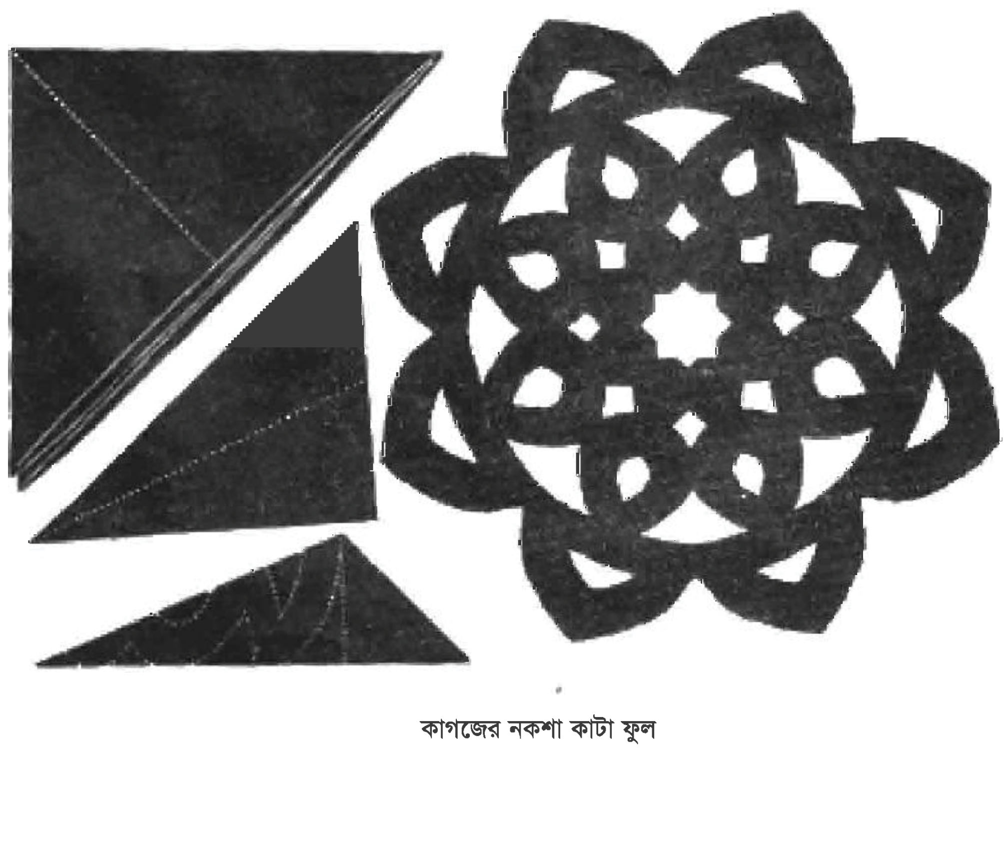

কাগজের নকশা কাটা ফুল

পাঠ: ৮ ও ৯

শাপলা ফুল

সাদা কাগজ নিয়ে রোল করি। রোলের অর্ধেক থেকে বেশি অংশ চওড়াতে কেটে নিই। রোলকে আলগা করে মুড়ে পাতার আকারে কেটে নিই। ভাঁজ করা কাগজ নিচের দিকে উল্টে নিই। রোলের মাঝখানে কাগজ নিচের পাখির মতো আসে এমনভাবে চেপে নিই। রোলকে লম্বা করে সাজিয়ে নিই, পাপড়িগুলো রোলের মাঝখানে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিই। এভাবে ফুল হয়ে যাবে।

(ছবি দেখে চেস্টা করি)

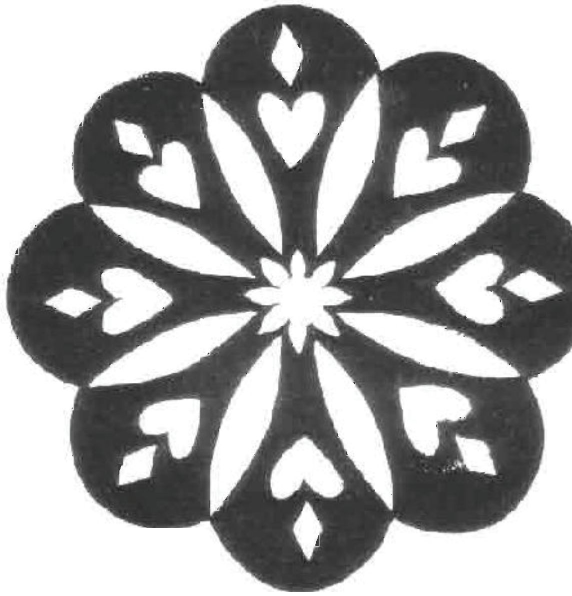

কাগজের নকশা কাটা অন্য একটি ফুল

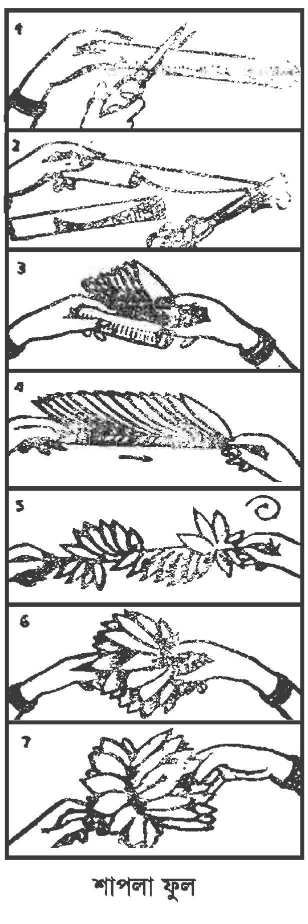

শাপলা ফুল

পাঠ: ১০ ও ১১

বাতির শেড

একটা স্কয়ার (চারকোণা) ৬x৬ ইঞ্চি, মাউন্ট বোর্ড কাগজ নেই। মাউন্ট বোর্ড কাগজটি অর্ধেক ভাঁজ করি এবং দশ সেমি. লম্বা কাটি, ভাঁজটি খুলে এবং উভয় দিকের শেষ প্রান্তে স্ট্যাপল পিন লাগাই।

বাতির শেড তৈরি হলো ।

(ছবি দেখে তৈরি করি)।

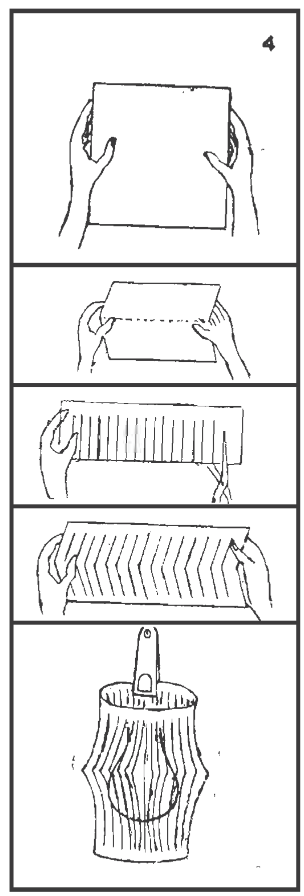

বাতির শেড তৈরি

পাঠ: ১২, ১৩ ও ১৪

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

যেসব জিনিস সাধারণত কোনো কাজে লাগে না, ফেলে দেওয়া হয়, আমরা চেষ্টা করলে তা দিয়েও সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় কিন্তু হেলাফেলা করে তাকাই না বা নজরে পড়ে না, এমন সব জিনিস দিয়েও আমরা শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি। যেমন-ডিমের খোসা, মালা, ছোট-বড় নুড়ি পাথর, গাছের ছোটখাটো ডাল, গাছের পাতা, কাঠের টুকরা, ছেঁড়া বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি। চারপাশে একটু ভালোভাবে তাকালে এমনি অনেক ফেলনা জিনিস পাব। একটু তাকালেই দেখবে ফেলনা জিনিসগুলো কত রকম কাজে লাগানো যায়। তাছাড়া নারিকেল পাতা, খেজুর পাতা ইত্যাদি দিয়েও নানারকম শিল্পকর্ম করতে পারি। আমরা কল্পনা, চিন্তাভাবনা এবং সুন্দর কিছু তৈরি করার ইচ্ছাটাকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে দেখি না? এমনি দু-একটি ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করার চেষ্টা করি।

ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল

নিখুঁত একটি ডিম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিই। হাঁসের ডিম হলেই ভালো, কারণ হাঁসের ডিমের খোলস একটু শক্ত হয়। ডিমের সরু মাথার ওপর দিকে খুব সাবধানে একটি ছিদ্র করি। ছিদ্রটির ব্যাস আধা ইঞ্চির বেশি না হলেই ভালো এবং ছিদ্রটি হবে সম্পূর্ণ গোল। ছিদ্র দিয়ে একটি কাঠি ঢুকিয়ে ডিমের ভেতরের কুসুম ও অন্য জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বের করে আনি। খোলসে পানি ঢুকিয়ে ভেতরটা ভালো করে ধুয়ে খোলসটা শুকিয়ে নিই।

এবার এক খন্ড বোর্ড কাগজ নিয়ে ২৫ সেমি. ৩০ সেমি. ব্যাসের (১২.৭-১৫.২ ব্যাসার্ধ নিয়ে) একটি বৃত্ত আঁকি। বৃত্তের রেখা বরাবর কাঁচি দিয়ে কেটে বোর্ড দিয়ে একটি চাকতি তৈরি করি। এবার চাকতিটিকে সমান তিন ভাগ করি। এক খন্ড তুলে নিয়ে চোখা মাথাটা সামান্য কেটে ফেলি, সোজা দুই কিনারা একটির ওপর অন্যটি তুলে ময়দার, লেই দিয়ে জোড়া দিই।

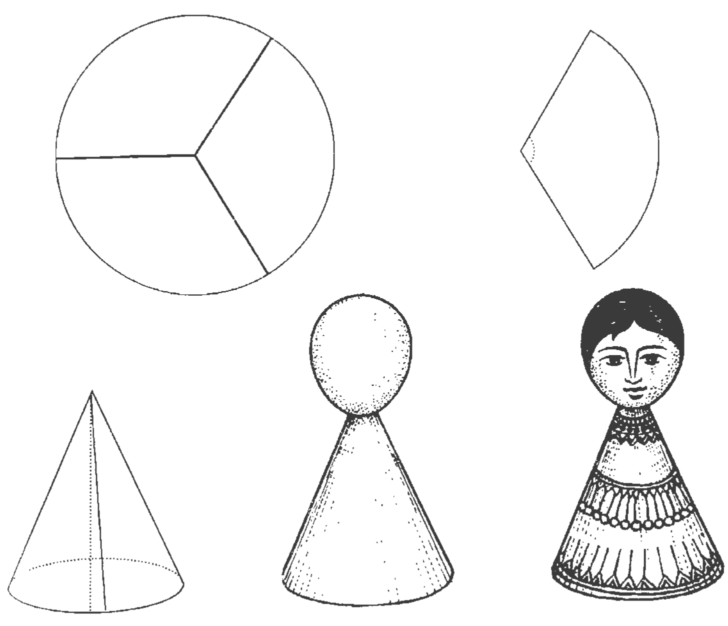

ডিমের খোসা ও কাগজ দিয়ে পুতুল তৈরি।

ডিমের খোসা ও কাগজ দিয়ে পুতুল তৈরি করি। আঠা দিয়ে জোড়া দিই। খেয়াল রাখব বোর্ড কাগজে সাদা মসৃণ পিঠ যেন বাইরের দিকে থাকে। জোড়া দিয়ে দেখি এক দিক চোখা, অপরদিক মোটা লম্বা চোঙার মতো একটা জিনিস তৈরি হয়ে গেল। এটির চোখা মাথাটি ডিমের খোলসের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে আঠা ও পাতলা সাদা কাগজ লাগিয়ে ভালো করে জোড়া দিই। ডিমের খোলসটি যেন চোঙার মাথায় সোজা হয়ে বসে যায়। আর জোড়ার কাগজ যেন ওপর থেকে চোখে না পড়ে। এবার ডিমের খোলসের ওপর পুতুলের চোখ, মুখ, নাক, চুল এবং বোর্ড কাগজের চোঙার উপর পুতুলের গলার মালা ও পোশাক এঁকে দিই। ফেলে দেবার জিনিস ডিমের খোলস দিয়ে সুন্দর একটা পুতুল হয়ে গেল।

পাঠ : ১৫, ১৬ ও ১৭

নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য

রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় ছোটবড় পাথর আমাদের চোখে পড়ে। নানা রঙের নানা আকৃতির পাথর। কোনো কোনোটি দেখে আমরা বেশ মজা পাই। কোনোটা দেখে মনে হয় একদম একটা প্যাঁচা, কোনোটা আবার পাখির মতো, কোনোটিতে যেন মানুষের মুখের একটা আদল আছে, আবার কোনোটা দেখে মনে হয় বেড়ালের মতো।

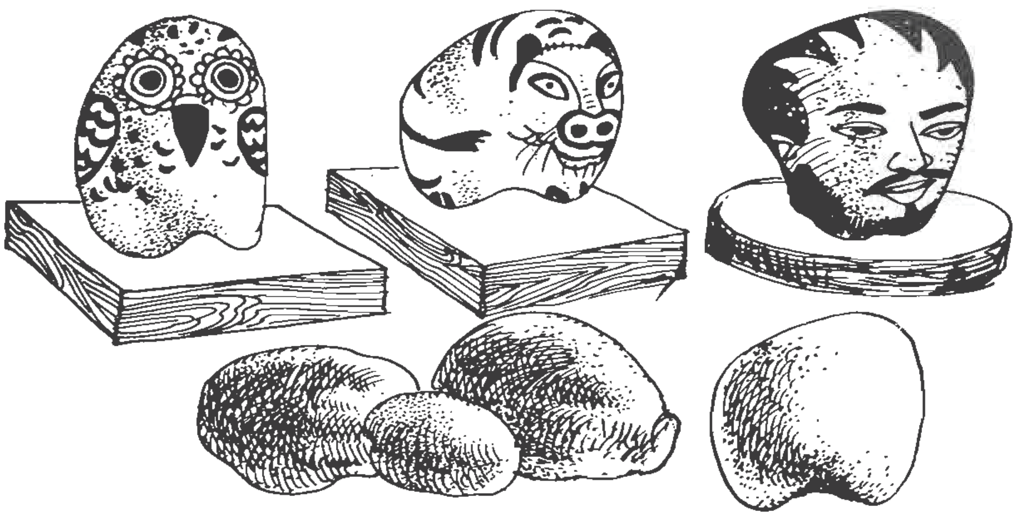

নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য

এরকম অনেক জীবজন্তু বা মানুষের চেহারার সঙ্গে মিলে যাওয়ার মতো নুড়ি পাথরের টুকরা একটু খুঁজলে পেয়ে যাব। যে পাথরগুলো আমাদের ভালো লাগবে সেগুলো তুলে নিয়ে আসব। ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিব। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি পাথরটা কিসের মতো। প্যাঁচা, মানুষ, বিড়াল নাকি অন্য কোনো প্রাণীর মতো। যে আকৃতি ভাবব সেটাকে আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য একটু আঁকা-জোকা করব। চোখ, কান, মুখ আঁকব, তারপর দেখব কেমন সুন্দর একটা শিল্পকর্ম হয়ে গেল। ভাস্কর্যটি কাঠের মানানসই টুকরার ওপর পেলিগাম কিংবা আইকা জাতীয় শক্ত আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিব। বাহ! নুড়ি পাথরের ছোট ভাস্কর্য সহজেই হয়ে গেল!

ভাঙা কাপ, প্লেট ইত্যাদির টুকরো দিয়ে সুন্দর মোজাইক ছবি তৈরি করা যায়। দোয়াতের বাক্স, আইসক্রিমের কৌটা, প্লাস্টিকের ফেলে দেওয়া কৌটা, ফেলে দেওয়া ছোট টিন ইত্যাদি দিয়ে অনেক সুন্দর খেলনা ও পেনসিল বক্স তৈরি করা যায়। তোমরা ছবি দেখে তৈরি কর। বিভিন্ন পাখির পালক দিয়েও সুন্দর সুন্দর ছবি তৈরি করা যায়।

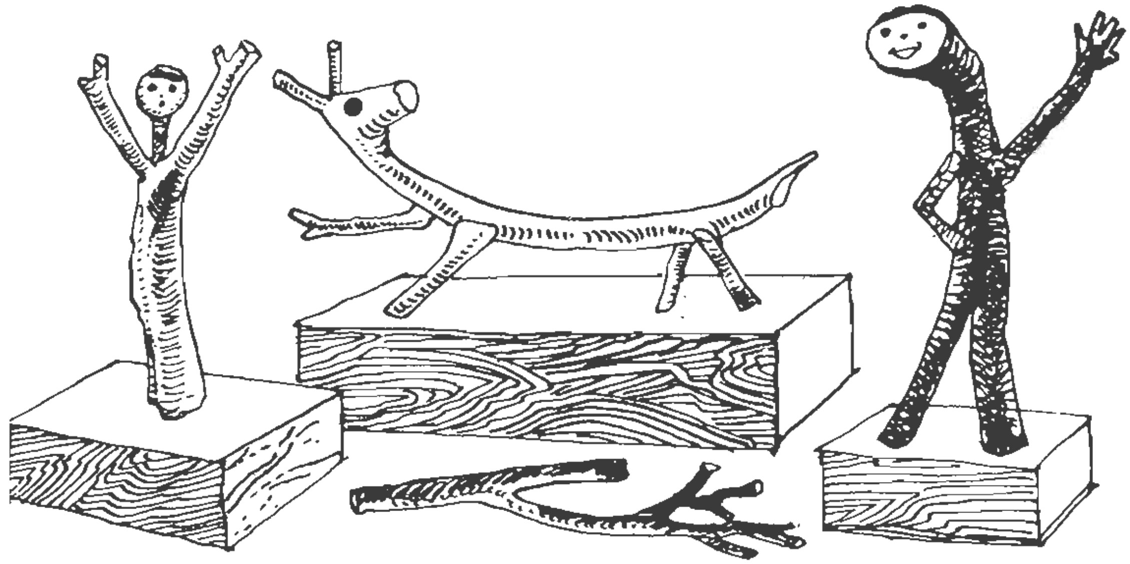

গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য

পাঠ : ১৮

পাতা দিয়ে জিনিস তৈরি

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা রয়েছে। সব গাছই মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গাছের পাতা আমাদের নানাভাবে কাজে লাগে। আমরা শুধু তালপাতা ও খেজুর পাতা দিয়ে কিছু জিনিস তৈরি শিখব। যেগুলো আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে।

তালপাতা, খেজুর পাতা ও নারকেল পাতা সংগ্রহ করব।

বাংলাদেশ প্রায় সব এলাকাতেই তালপাতা, নারকেল পাতা ও খেজুর পাতা কমবেশি পাওয়া যায়। আমাদের এগুলো সংগ্রহ করা তেমন কষ্টসাধ্য হবে না। কিছু তৈরির পূর্বে সামান্য লবণ যোগে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করে নিলে তৈরি জিনিস সতেজ ও টেকসই হবে।

পাতা দিয়ে বাঁশি তৈরি

তালপাতা, খেজুর পাতা ও নারকেল পাতা একই পদ্ধতিতে রং করা যায়। কিছু পাতা সাদা ও কিছু পাতা রঙিন করলে তৈরিকৃত জিনিস আরো আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন হবে। বাজারে রঙের দোকানে এক জাতীয় গুঁড়ো রং পাওয়া যায়। সামান্য রং, পরিমিত পানি ও কয়েক ফোটা এসিটিক এসিড সহকারে ফুটন্ত পানিতে শুকনো পাতাগুলো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। নামাবার পূর্বে পরিমাণমতো গুঁড়ো সাবান দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকিয়ে নিলে কাজের উপযোগী রঙিন পাতা হয়ে গেল। এসিড পাওয়া না গেলে পরিবর্তে সামান্য লবণ দিয়ে নামিয়ে নিব। এই পাতাগুলো দিয়ে নিচের ছবিগুলো দেখে চশমা, বাঁশি, ঘড়ি ইত্যাদি আমরা তৈরি করার চেষ্টা করি। (ছবি দেখে চেষ্টা করি)

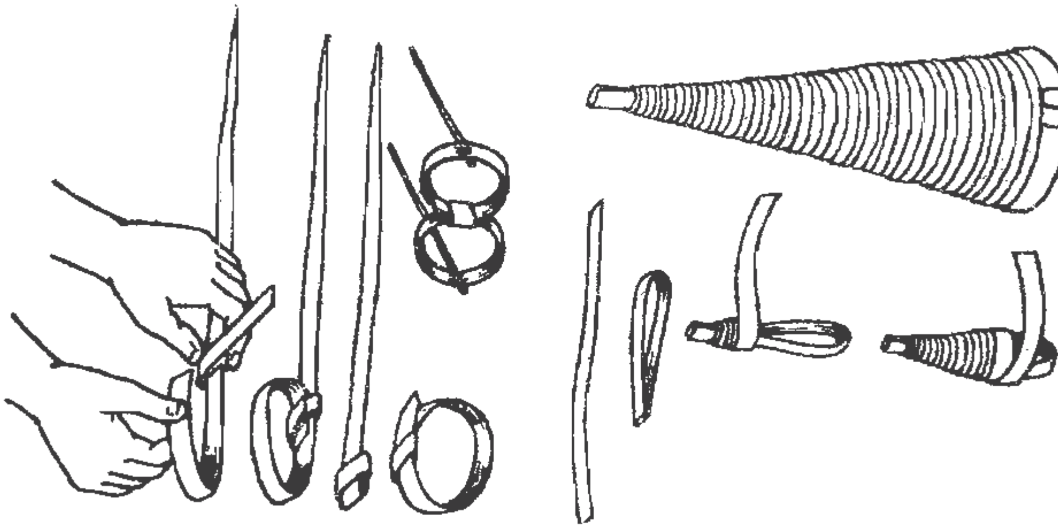

নারিকেল পাতা দিয়ে চশমা, ঘড়ি ও বাঁশি তৈরি

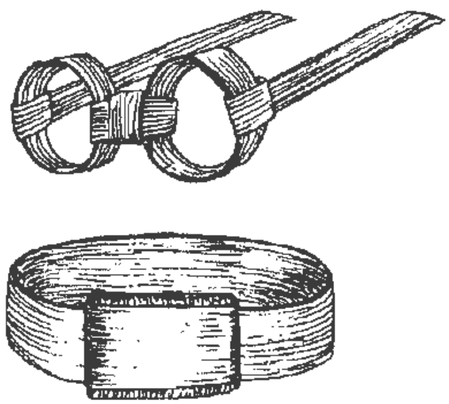

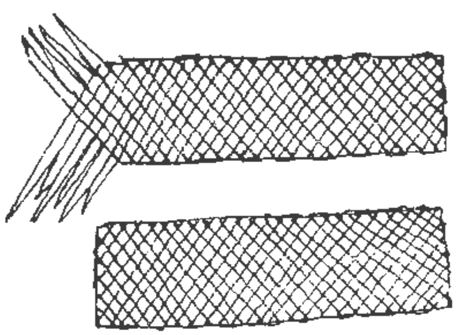

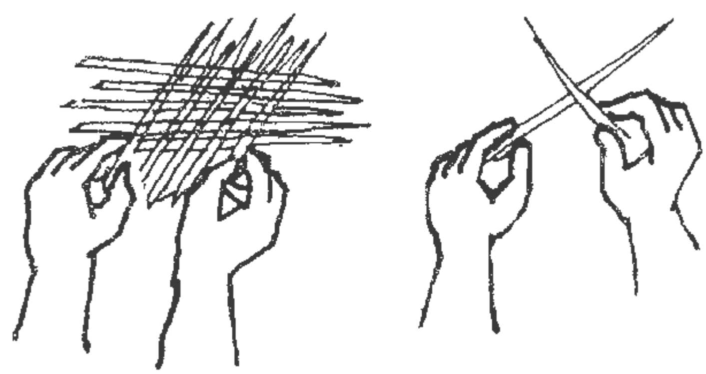

পাতা দিয়ে শিল্পকর্ম

পাঠ: ১৯

পালক ও ছোট কৌটা দিয়ে শিল্পকর্ম

ছবি দেখে এঁকে আইকা আঠা দিয়ে পালকগুলো বসিয়ে কাজটি করি।

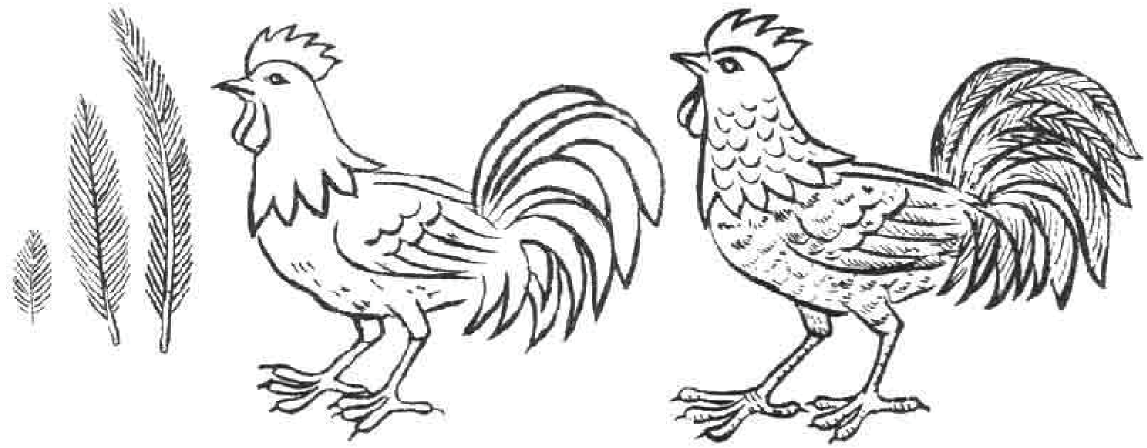

পালকের শিল্পকর্ম

পাঠ: ২০

(ছবি দেখে চেষ্টা করি)

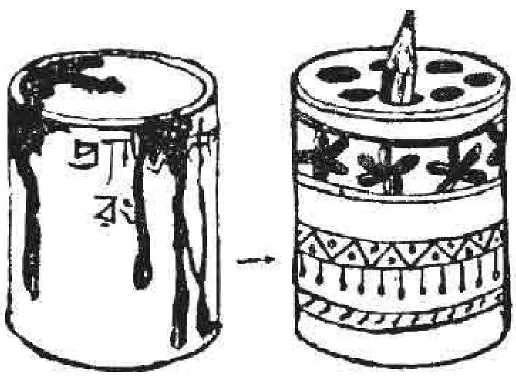

ফেলে দেয়া কৌটার শিল্পকর্ম

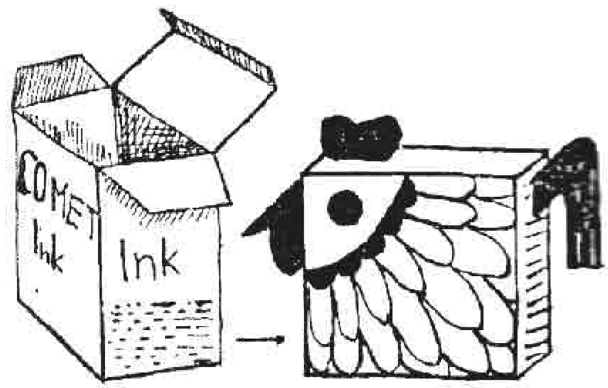

কালির দোয়াতের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কাগজের নকশার জন্য উপযোগী কাগজের নাম-

(ক) কার্ট্রিজ পেপার (খ) মাউন্ট বোর্ড পেপার
(গ) রঙিন পোস্টার পেপার (ঘ) আর্ট পেপার

২। পোস্টার পেপারের মাপ-

(ক) ২২ X ২৮ ইঞ্চি (খ) ২০ X ৩০ ইঞ্চি
(গ) ৩১ X ৪২ ইঞ্চি (ঘ) ১২ X ২৪ ইঞ্চি

৩। নকশা কাটা যায়–

(ক) যেকোনো পেপার দিয়ে (খ) মাটি দিয়ে

(গ) বালি দিয়ে (ঘ) চিনি দিয়ে

৪। ফেলনা জিনিস দিয়ে তৈরি করা যায়–

(ক) মাটির পুতুল (খ) ভাস্কর্য

(গ) পোস্টার (ঘ) সুচিশিল্প

৫। রঙিন কাগজ দিয়ে–

(ক) উৎসবে ঘর সাজানো যায় (খ) কুশন তৈরি করা যায়

(গ) খাবার তৈরি করা যায় (ঘ) পোশাক বানানো যায়

বাম পাশের সাথে ডান পাশের বিষয়ের মিল কর :

বাম	ডান
পোস্টার লেখা হয়	নুড়ি পাথর দিয়ে
নকশা তৈরি করা যায়	ঘুড়ির কাগজ দিয়ে
ঘুড়ি তৈরি হয়	পোস্টার পেপার দিয়ে
ভাস্কর্য তৈরি করা যায়	বোর্ড কাগজ দিয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

কাগজ সভ্যতার বাহন, শিক্ষার প্রধান উপকরণ। লেখাপড়ার কাজে আমরা কাগজ ব্যবহার করি। বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি রং-বেরঙের কাগজ। এ কাগজ আমরা ফেলেও দিই। কিন্তু চাইলেই এ কাগজ ব্যবহার করে সুন্দর-সুন্দর জিনিস বানাতে পারি, উৎসব অনুষ্ঠানে ঘরবাড়ি সাজাতে পারি।

ক) শিল্পকর্ম কী?

খ) 'কাগজ সভ্যতার বাহন'– ব্যাখ্যা কর।

গ) কাগজের শিল্পকর্ম ঘর সাজাবার উপকরণ, অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এটি গুরুত্বপূর্ণ-কথাটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন : ২

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

মিলি ও ফাহিমদের বাসায় প্রতিদিন পুরনো কাগজ, নারিকেলের মালা, ডাব, শেষ হয়ে যাওয়া বল পয়েন্ট কলম, মাছের আঁইশ, ডিমের খোসাসহ ঘরে ব্যবহৃত নানা বর্জ্য ময়লার ঝুড়িতে ফেলা হয়। কিন্তু এসব বর্জ্য ফেলে না দিয়ে ঘর সাজাবার সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায়।

ক) ফেলনা জিনিস কী?

খ) উদ্দীপকের আলোচনা থেকে কোন কোন ফেলনা জিনিস ব্যবহার করা যায় লেখ।

গ) মিলি ও ফাহিমদের বাসার বর্জ্য থেকে কীভাবে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায় বর্ণনা কর।

ঘ) মিলি ও ফাহিমদের এসব জিনিসকে কীভাবে কাজে লাগাতে পার- বিশ্লেষণ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন :

লিখে জবাব দাও

১। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাগজের ব্যবহার সম্পর্কে দশ লাইনে একটি বর্ণনা দাও।

২। তোমার স্কুলে কোনো অনুষ্ঠান হলে কাগজ দিয়ে কীভাবে তুমি স্কুল সাজাতে পারবে সংক্ষেপে তার একটি বর্ণনা দাও।

৩। এক তা রঙিন ঘুড়ির কাগজ সাধারণত কী মাপের হয়? কোনো কাগজ নষ্ট না করে এক তা কাগজ কাটলে ২৫ সেমি. লম্বা ও ১৯.০৫ সেমি.-চওড়া কত টুকরো কাগজ হবে?

ব্যবহারিক (Activity)

১। তোমার নিজের পছন্দের নকশা কেটে একটি নকশা কাটা ঝালর তৈরি কর। অবিকল একই নকশায় আরও ৩টি ঝালর তৈরি করে সুতলির মধ্যে লাগিয়ে টানিয়ে দেখাও।

২। তোমার পছন্দমতো তিনটি নকশা ব্যবহার করে তিনটি নকশা কাটা ফুল তৈরি কর।

৩। লম্বা লম্বা রঙিন কাগজ কেটে নানারকম ঝালর তৈরি কর।

৪। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাগজের ব্যবহার অপরিহার্য কেন? তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তুমি যত ধরনের কাগজের নাম জান তা লেখ।

৫। কাগজের তৈরি নকশা, ঝালর, শিকা, শেকল প্রভৃতি জিনিস সাজসজ্জার কাজে তুমি কীভাবে ব্যবহার করতে পার তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৬। তোমরা কোন কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে ও পাড়ায় রঙিন কাগজ দিয়ে সাজসজ্জা কর?

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

১। ডিমের খোলস দিয়ে একটি পুতুল তৈরি কর।

২। নুড়ি পাথর দিয়ে একটি ছোট ভাস্কর্য তৈরি কর।

৩। নুড়ি পাথরে রং করে একটি পেপার ওয়েট তৈরি কর।

৪। গাছের ডাল দিয়ে একটি ভাস্কর্য তৈরি কর।

৫। দোয়াতের বাক্স দিয়ে একটি খেলনা তৈরি কর।

৬। পাখির পালক দিয়ে একটি খেলনা অথবা একটি ছবি তৈরি কর।

৭। বিভিন্ন ফেলে দেওয়া কৌটা দিয়ে খেলনা তৈরি কর।

৮। ফেলে দেওয়া টিনের কৌটা দিয়ে একটি পেনসিল বক্স তৈরি কর।

রং ও রঙের ব্যবহার

প্রাথমিক রং

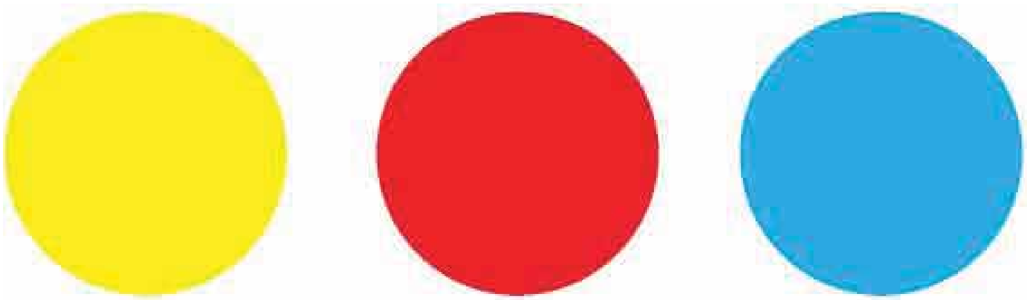

হলুদ লাল নীল

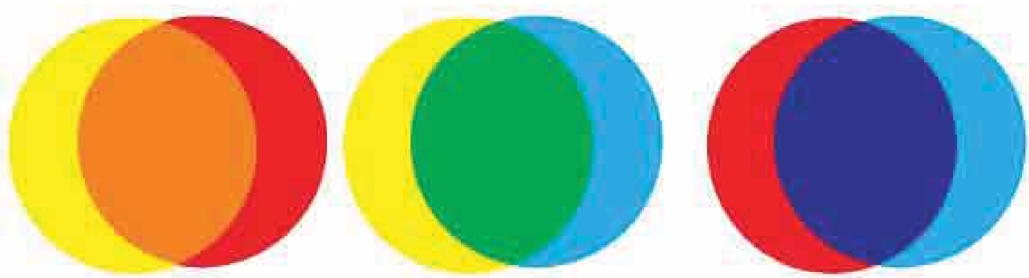

হলুদ + লাল = কমলা হলুদ + নীল = সবুজ লাল + নীল = বেগনি

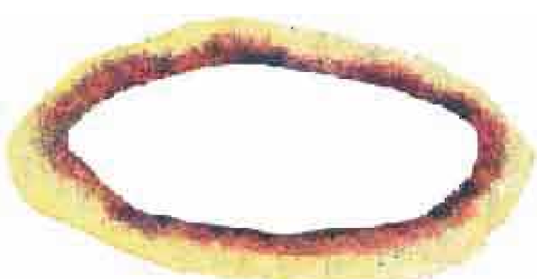

সাদা কালো

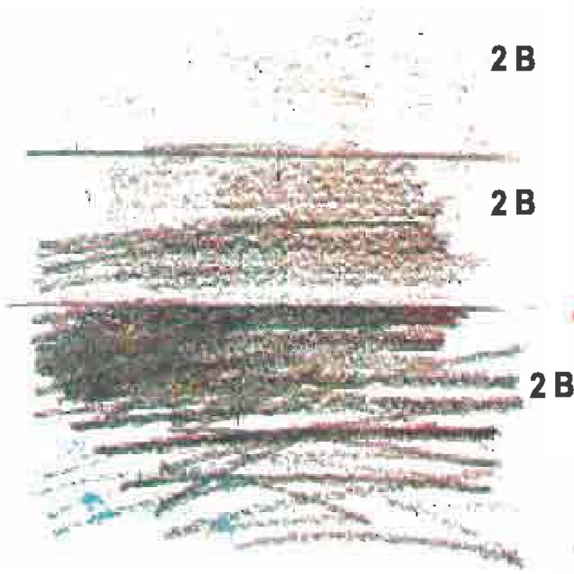

পেন্সিলের রেখা, উপরে 2 B
মাঝখানে 4 B ও নিচে 6 B

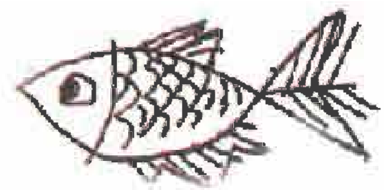

নিবের কলম ও কালির আঁকা

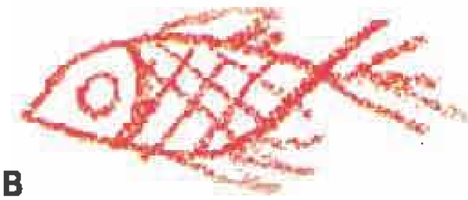

ক্রেয়নে আঁকা

তুলি ও কালিতে আঁকা

পোস্টার রঙে আঁকা একটি ছবি

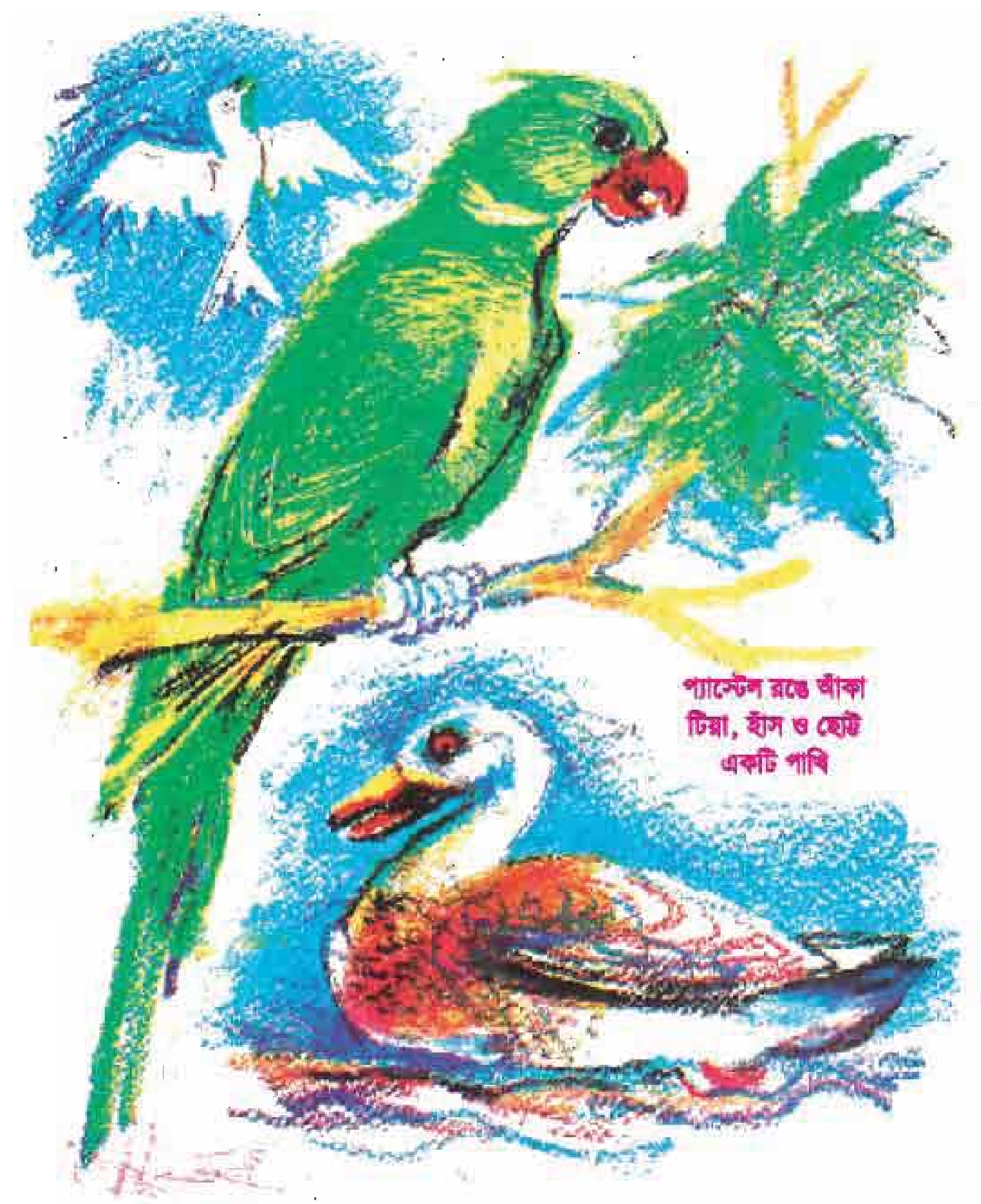

প্যাস্টেল রঙে আঁকা টিয়া, হাঁস ও ছোট একটি পাখি

পেন্সিলে আঁকা

কালি ও তুলিতে আঁকা

জলরঙে আঁকা মোরগের ছবি

জল রঙে আঁকা নদীর ঘাট

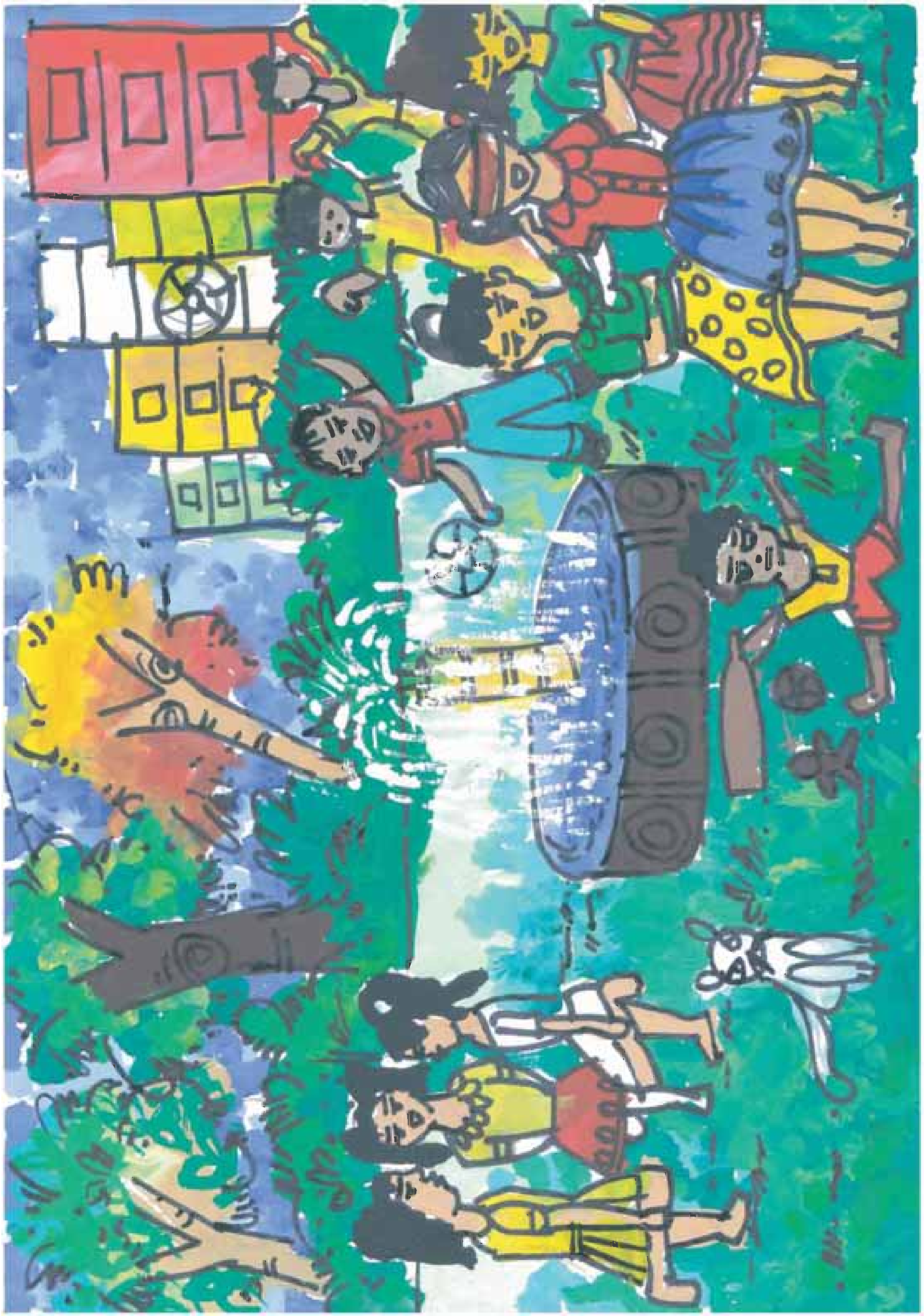

পোস্টার রঙে ছবিটি এঁকেছে– আহমেদ জুবায়ের অঙ্কু, বয়স-১২ বছর

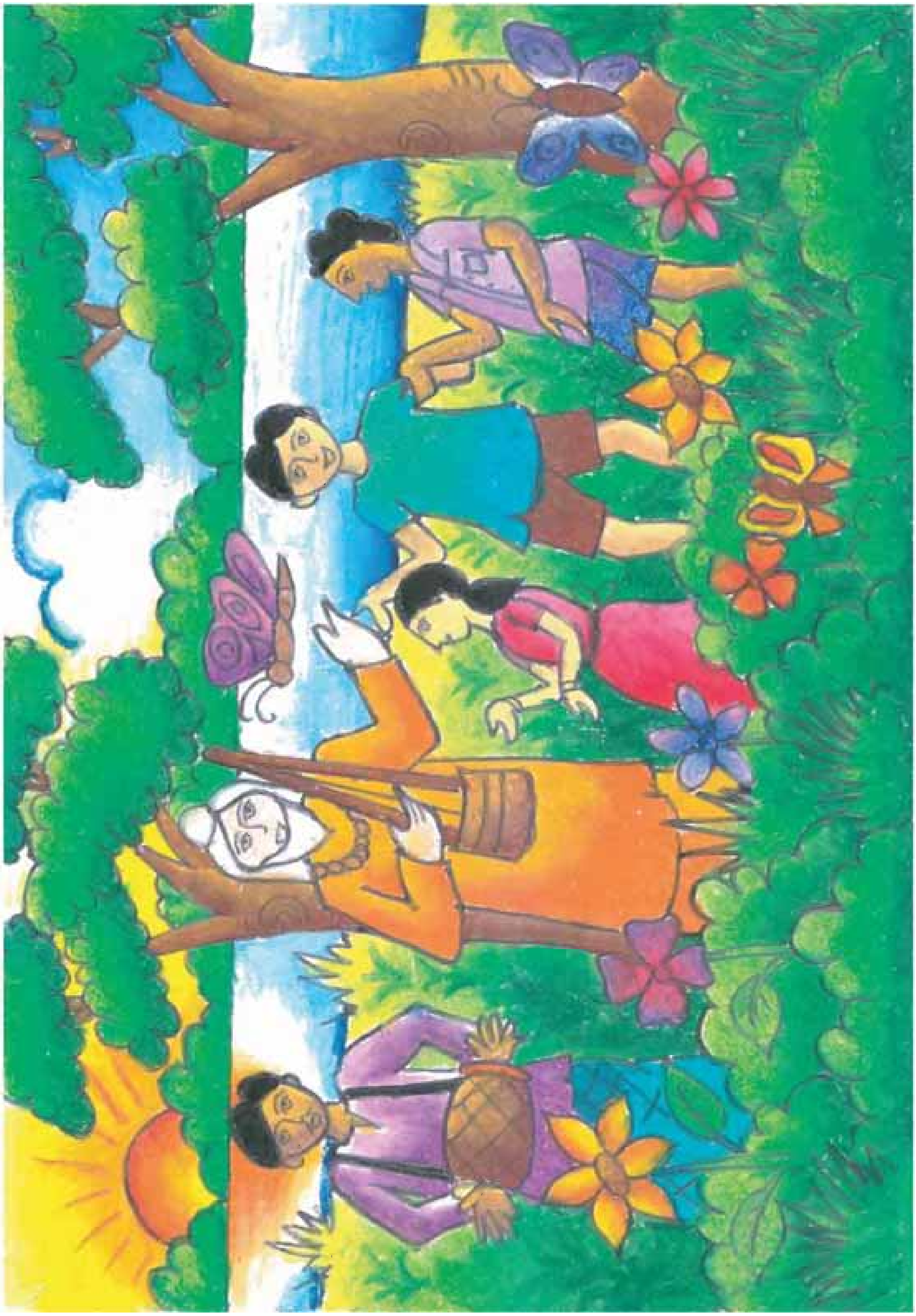

পেস্টেল রঙে ছবিটি এঁকেছে– শাদমান সাকিব জাহিন

কালার পেনসিলে আঁকা মিষ্টিকুমড়ার ফালি

২০১৩

শিক্ষাবর্ষ

৬–চারু ও কারু

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :